প্রতিদিন প্রয়োজন

ড. সুভাষ সান্যাল



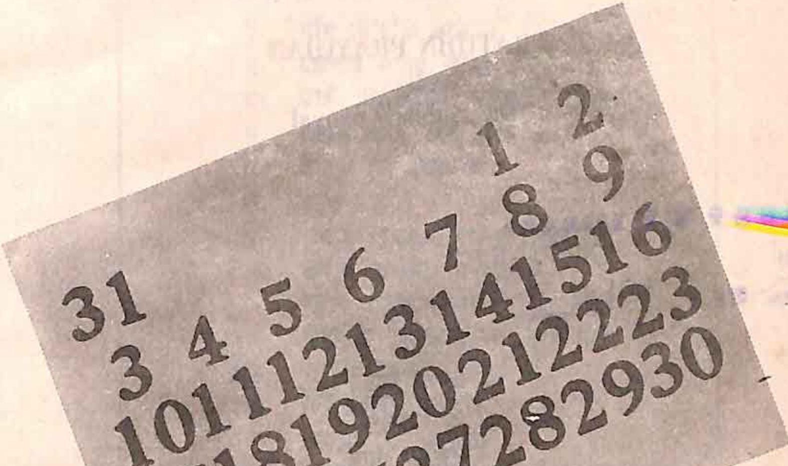
প্রতিদিন প্রয়োজন

পত্র ভারতী

ড. সুভাষ সান্যাল

প্রতিদিন প্রয়োজন

পত্র ভারতী □ PATRA BHARATI



৩/১ কলেজ রো, কলিকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ১৯৮৮

PRATIDIN PRAYOJAN

By

Dr. Subhas Sanyal

প্রচ্ছদ
বাবলু মিত্র

অঙ্গসজ্জা
ইন্দ্রনীল ঘোষ

মূল্য
দশ টাকা

'পত্র ভারতী'র পক্ষে ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।

প্রতিদিন যে সমস্যাগুলি সম্পর্কে
জানা একান্ত প্রয়োজন :

১. যদি হেঁচকি ওঠে
২. প্রেশার মাপা কঠিন নয়
৩. হার্ট অ্যাটাকের ব্যাপার-স্যাপার!
৪. পেটে যদি 'বিষ' যায়
৫. হঠাৎ যদি কেটে যায়
৬. হুল
৭. ওষুধ খাওয়ার হরেক নিয়ম
৮. ওষুধ খাওয়ার রকমফের
৯. হঠাৎ পুড়ে গেলে
১০. চামড়ার জিনিসে যদি দাগ ধরে
১১. জামাকাপড়ের দাগ
১২. টিউবলাইট সমস্যা
১৩. বিদ্যুৎ থেকে বিভ্রাট
১৪. বিদ্যুৎ—বুদ্ধিমানেরা যেসব ভুল করেন
১৫. রান্নাঘরের টুকিটাকি—১
১৬. রান্নাঘরের টুকিটাকি—২
১৭. জলের কলে 'লিক'
১৮. ডিম নিয়ে জানা চাই
১৯. টুকিটাকি সমস্যা—১
২০. টুকিটাকি সমস্যা—২
২১. বাজারের ভেজাল ধরতে হলে

যদি হেঁচকি ওঠে.....

রোববার দুপুরে খেতে বসে প্রায় কান্না এসে গেলো পিংকুর। কতদিন পরে ফ্রায়েড রাইস আর মুরগীর মাংস হলো ছোটকাকুর 'অনারে', আর পিংকু কি না ঠিক এই সময়েই...হিক্। হিক্।......

বাবা বললেন,–পিংকু, একটু জল খাও। এখুনি হেঁচকি থেমে যাবে।

কাতরভাবে মাথা নাড়লো পিংকু,–ইতিমধ্যে দু'গ্লাস জল খাওয়া হয়ে গেছে। আর কতো খাব? জল খেয়েই যদি পেট ভরাই, তবে এমনসব জিনিসগুলো ধরাবো কোথায়?

বাটি থেকে মাংস ঢালতে ঢালতে ছোড়দা বললো,–মনে মনে ত্রিশ; উনত্রিশ, আটাশ...এমনিভাবে উল্টোদিকে গুনে যা। থেমে যাবে ঠিক। আমাদের স্কুলে একজন বলছিলো, অন্যদিকে মন দিলে হেঁচকি আপনিই থেমে যায়।

নাক টিপে ধরলেও অনেক সময় হেঁচকি কমে কিন্তু।–পাশ থেকে মন্তব্য করে ছোটপিসি।

হিক্। হিক্।...থামছে না যে।–করুণ দৃষ্টিতে ছোটকাকুর দিকে তাকায় পিংকু।

–মেজদা, তোমার ব্যাগে কোন ওষুধপত্র নেই? বেচারা শুধু শুধুই......

মেজকাকা বরাবরই কম কথার মানুষ। ছোটকার প্রশ্ন শুনে মুখ খুললেন এবার।

–কথায় কথায় কি ওষুধ গিললেই হলো? টানা তিন-চার ঘণ্টা হেঁচকি উঠলে তবেই ওষুধের কথা ভাবতে হবে।

বাবা বিস্মিতভাবে বললেন,–সে কি? অতক্ষণ একটানা হেঁচকি কেউ তোলে না কি?

–সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে গন্ডগোলটা অন্যত্র। অনেকসময় কিডনির গন্ডগোল বা অ্যাপেনডিসাইটিসের উপসর্গ হিসেবে হেঁচকি জুটে যেতে পারে। অবশ্য এগুলো বেশ বিরল ঘটনা।

কিন্তু মেজদা, হেঁচকি ওঠে কেন বলতো?–পাশ থেকে জিজ্ঞাসা করে ছোটপিসি।

–বলছি। কিন্তু তার আগে তুই একটা কাজ করতো। ঐ যে মিটকেসের ওপর একটা পলিথিনের ব্যাগ দেখছি, ওটা পিংকুকে দে তো।

ব্যাগ দিয়ে কি করবে,–বলতে বলতে উঠে পড়ে ছোটপিসিঃ ওটাতে তো পিংকুর একটা জামা এসেছিল সেদিন।

–দেখ না কি করি! পিংকু, ঠোংগাটার ভেতর মুখ ঢুকিয়ে দে। দিয়েছিস? এবার ঐ ঠোংগার মধ্যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চালা। নাক-মুখ বার করবি না একদম।

ছোটপিসির দিকে চেয়ারটা ঘুরিয়ে নেন মেজকাকাঃ আসলে হেঁচকির সংগে যোগাযোগ আছে 'ফ্রেনিক নার্ভ' বলে একটা বিশেষ নার্ভের। এই ফ্রেনিক নার্ভ কোন কারণে উত্তেজিত হয়ে পড়লে বুক পেটের মাঝখানের



পর্দা বা ডায়াফ্রামের ওপর টান বেড়ে যায়। ডায়াফ্রামের সংগে শ্বাসপ্রশ্বাসের যোগাযোগ–ডায়াফ্রামে টান পড়লে শ্বাসের ছন্দ বদলে যায়, শুরু হয় হেঁচকি।

–কিন্তু ফ্রেনিক নার্ভ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়ে কেন?

–বলছি। তার আগে পিংকু, ঠোঙাটার থেকে মুখ বার করে নে। কি রে? আর হেঁচকি উঠছে?

পিংকু বলে–তাই তো! থেমে গেছে দেখছি! এটা কেমন করে হলো?

মেজকাকা হাসলেন,–আগে দীপার প্রশ্নের উত্তরটা দিই। তারপরে তোরটা। ফ্রেনিক নার্ভ উত্তেজিত হবার নানা কারণ থাকতে পারে। তবে সব থেকে বেশী যেটা দেখা যায়, তা হলো শুকনো কিছু খাবার তাড়াতাড়ি গেলার চেষ্টা বা হঠাৎ ঝাল খেয়ে ফেলার থেকে হেঁচকির সূত্রপাত।

ছোটপিসি বললো,–শুকনো খাবারের সংগে হেঁচকির যোগসূত্র কি?

—শুকনো খাবার ধাক্কা দেবে অন্ননালী বা 'ইসোফেগাসের' ভেতরের দেওয়ালে। এখান থেকে স্নায়ু মারফৎ খবরটা 'রিলে' হয়ে ফ্রেনিক নার্ভকে উত্তেজিত করে। যেহেতু ফ্রেনিক নার্ভের অনেকগুলো শাখা, এবং তার একটা অন্ননালী এবং অপর একটা ডায়াফ্রামে শেষ হয়েছে—সেইসূত্রে এই দুটোর মধ্যে যোগাযোগ আছে বৈকি। ঝাল খেলেও একই ব্যাপার!

পিংকু বলে ওঠে,—তাহলে ঠোঙার ভেতর মুখ ঢোকাতে হেঁচকি বন্ধ হলো কেন?

—একই বাতাস থেকে শ্বাস প্রশ্বাস চালালে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ে, বাড়ে ফুসফুস আর রক্তে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণও। শরীরের বিশেষ বিশেষ রক্তনালীতে এক ধরনের 'গ্রাহক কোষ' থাকে যাদের কাজ রক্তে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণের খোঁজ খবর রাখা। যখনই রক্তে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাড়লো, 'গ্রাহক-কোষ'রা উত্তেজিত হয়ে খবর পাঠালো ব্রেনে—'ফ্রেনিক নার্ভকে শান্ত কর'! আর এটা তো জানাই আছে, ফ্রেনিক নার্ভের উত্তেজনা কমলে শ্বাস প্রশ্বাসের হারের তারতম্য হয়, ডায়াফ্রামের ওপর চাপ কমে, হেঁচকিও যায় বন্ধ হয়ে।

ছোটকাকা বললো—বাঃ! একটা নতুন জিনিষ জানা হলো। হেঁচকি উঠলেই এবার নাক-মুখ ঠোঙায় ঢাকতে হবে।

মেজকাকা বললেন—তবে সাবধান, বেশিক্ষণ ওভাবে থাকা চলবে না, কারণ একটানা ঠোঙার মধ্যে থেকে শ্বাস প্রশ্বাস চালালে অজ্ঞান হয়ে পড়াও কিন্তু বিচিত্র নয়!



প্রেশার মাপা কঠিন নয়!

যাঁদের বাড়িতে হাই-ব্লাড প্রেশারের রোগী বা রোগিণী আছেন, তাদের প্রায়শঃই একটা সমস্যায় পড়তে হয়। সমস্যাটা হলো নিয়মিতভাবে প্রেশার মাপানোর সমস্যা। ডাক্তারখানায় গেলে বসে থাকতে হয়, আর কম্পাউন্ডার বাবুকে বলে রাখলে কখন যে আসবেন তার ঠিক নেই। অথচ অনেকসময়ই ডাক্তারবাবু বলে দেন, সপ্তাহে অন্ততঃ দু-তিন বার প্রেশারটা 'চেক-আপ' খুবই দরকারি।

বাড়িতে কেউ ডাক্তার থাকলে সমস্যার সমাধান, কিন্তু কজনেরই বা সেই সুযোগ থাকে? অথচ বাড়িতে যদি একটা স্পিগমোম্যানোমিটার আর একটা স্টেথিস্কোপ থাকে, সমস্যাটার সমাধান হয়ে যায় সহজেই। দামও খুব একটা বেশি নয়–দুশো-আড়াইশো টাকাতেই কাজ চলার মতো যন্ত্র কিনতে পাওয়া যায়।

কি করে প্রেশার মাপতে হয় তা বলার আগে বরং রক্তচাপ সম্বন্ধে দু-একটা কথা জেনে রাখা ভাল। রক্তচাপ–অর্থাৎ রক্ত কত জোরে রক্তনালীর গায়ে ধাক্কা দিচ্ছে। যখন হার্ট সবথেকে জোরে পাম্প করে তখন ধাক্কা সবচেয়ে জোরালো–পরিভাষায় সিস্টোলিক প্রেশার। হার্ট যখন প্রসারিত হয় তখন ধাক্কার জোর সবথেকে কম। এটাই ডায়াস্টোলিক প্রেশার। লেখার সময় সিস্টোলিক লেখা হয় ওপরে, ডায়াস্টোলিক নিচে। একজন সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে বয়সের সঙ্গে ১00 যোগ করলে মানটা দাঁড়ায় সিস্টোলিক প্রেশারের কাছাকাছি, আর ডায়াস্টোলিকের আন্দাজ মিলবে বয়সের সঙ্গে ৪0 যোগ করলে। অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। কোন প্রেশারটা কিসের সূচক সেটা বরং এবার জেনে নেওয়া যাক। সিস্টোলিক প্রেশার জানায় হার্টের সর্ব্বোচ্চ পাম্প করার ক্ষমতা বা কত জোরে হার্ট রক্তকে ঠেলছে। এই সিস্টোলিক প্রেশার খুব সহজেই পরিবর্তনশীল–একটু জোরে হাঁটাহাঁটি করলে, খুব ভরপেট খেলে, ভয় পেলে বা উত্তেজিত হলেই খানিকটা বেড়ে যায়। খানিকটা পর আবার স্বাভাবিক। তাই ব্লাড-প্রেশার মাপার আগে উচিত রোগীকে বলা মিনিট পাঁচেক চুপচাপ শুয়ে থাকতে। ডায়াস্টোলিক

প্রেশার চট্ করে ওঠানামা করে না, তবে একবার বাড়লে কমতেও চায় না সহজে।

এবার বরং সরাসরি রক্তচাপ মাপার ব্যাপারে আসি। যে পদ্ধতিটা কাজে লাগানো হয় তার নাম 'ইনডিরেক্ট অসকালটেটরি মেথড'। অর্থাৎ বিশেষ একটি রক্তনালীর 'অসকালটেশন' বা নড়াচড়া দেখে পরোক্ষভাবে প্রেশারটা মাপা হচ্ছে।

এখন আমরা ব্লাড-প্রেশার মাপার যন্ত্রটা দেখবো। ডালাটা খুলে ফেললে দেখা যাবে একটা 'স্কেল' লাগানো পাশে একটা 'মার্কারী কলাম' মানে কাঁচের টিউবের মধ্যে পারদ আছে। ব্যাপারটা অনেকটা পারদ-ব্যারোমিটারের মতো, তবে সাইজে 'মিনি'। পাশের স্কেল থেকে বোঝা যাবে পারদ কতটা উঠছে বা নামছে। ব্যারোমিটার যেমন 'অ্যানিরয়েড'



হতে পারে, স্পিগমো ম্যানোমিটার বা প্রেশার মাপার যন্ত্রও তেমনি অ্যানিরয়েড টাইপও আছে। অ্যানিরয়েড টাইপ ব্যবহার করাই সুবিধেজনক—এটা চট্ করে ভাঙার ভয় কম, দামেও সস্তা। এখানে পারদের বদলে একটা 'ডায়ালে' কাঁটার নড়াচড়া দেখে প্রেশারটা বুঝতে হয়। কনুই-এর উল্টোদিকে হাতের ভাঁজের ভেতর দিক বরাবর আঙুল রাখলে বোঝা যায় একটা রক্তাবহা নালী দপদপ্ করছে। এটাই ব্রেকিয়াল আর্টারী। এখানে স্টেথো বসালে প্রথমটাতে আওয়াজ পাওয়া যাবে না, কারণ রক্ত তখন কোনরকম বাধা না পেয়েই ধমনীর মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। এবার কাপড়ে ব্যাগটা জড়ান হলো বাহুমূলে। ব্যাগের সঙ্গে একটা লাগোয়া রবারের টিউব—টিউবের মুখে একটা রবারের বলের মতো হাত পাম্প। হাত পাম্পের মুখে একটা, স্ক্রু—যেটা ঘুরিয়ে ইচ্ছেমতো

ব্যাগে বাতাস পোরা যায় বা বার করে নেওয়া যায়, অবশ্য সেইসঙ্গে পাম্পটা টিপে চালাতে হবে। প্রথমে পাম্প করতে হাতে বাঁধা ব্যাগটার মধ্যে বাতাস পূরে দেওয়া হলো। সাধারণতঃ মার্কারী কলমে পারদ সীমা তোলা হয় ১৭৫-১৮০ পর্যন্ত। (অবশ্য যাদের সিস্টোলিক প্রেশার আরো বেশি, তাদের ক্ষেত্রে আরো বেশি বাতাসের চাপ তুলতে হয়)।

এবার আস্তে আস্তে বাতাসের চাপ কমাতে হবেস্ক্রু আলগা করে। সেক্ষেত্রে রক্তবাহী ধমনীর ওপর চাপও আলগা হবে, ফলে একটুখানি রাস্তা দিয়ে অনেকটা রক্ত হুড়মুড় করে যাবার চেষ্টা শুরু করবে। দপ্‌দপ্ করে ঐ আওয়াজটাই প্রথমে কানে আসবে স্টেথোর মাধ্যমে। এটাই 'সিস্টোলিক' প্রেশার। এখানে প্রেশার মাপার মূলনীতিটা হচ্ছে যে আমরা ধমনীর রক্তচাপের সঙ্গে ব্যাগের বাতাসের চাপকে 'ব্যালান্স' বা সমান করার চেষ্টা করছি এবং বাতাসের চাপ কত হচ্ছে সেটা বুঝছি 'ম্যানোমিটার' দেখে।

ক্রমে চাপ যত কমবে, রক্ত যাবার জন্যে জায়গাও পাবে বেশি। তখন 'স্টেথোতে' আওয়াজ কমতে কমতে শেষে ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে যাবে। যে মুহূর্তে আওয়াজটা মিলিয়ে গেল অর্থাৎ তাড়াতাড়ি চলার থেকে গতিটা রক্তের স্বাভাবিক হয়ে গেল, সেটাই 'ডায়াস্টোলিক' প্রেশার।

আর শেষে বলি—যন্ত্রটা মাঝে মাঝে 'ক্যালিব্রেট' করানো দরকার। অর্থাৎ মাপার ব্যাপারে যান্ত্রিক কোন ত্রুটি থাকছে কি না। সেক্ষেত্রে ত্রুটির পরিমাণ একটা 'স্ট্যান্ডার্ড' যন্ত্রের সাপেক্ষে মেপে (যেটি যন্ত্রের দোকানে আর দু-একটা দামী যন্ত্রে মেপে ঠিককরে নেওয়া যায়) 'কারেকশন ফ্যাক্টর' বার করে তা দিয়ে যন্ত্রের রিডিং-কে গুণ করে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে মানটা হবে সঠিক মানের খুব কাছাকাছি। একটা বরং উদাহরণ নেওয়া যায়। একটি দামী এবং দোকান থেকে যার রিডিং 'স্ট্যানডার্ড' বলে চিহ্নিত আছে এমন একটি যন্ত্রে সিস্টোলিক প্রেশারের মান হলো ১২০ মিলিমিটার পারদচাপের সমান। যে যন্ত্রটিকে আমি কিনেছি তাতে একই মানুষের সিস্টোলিক প্রেশার দেখালো ১৩০। এক্ষেত্রে কারেকশন ফ্যাক্টর হবে ১২০/১৩০ বা ০.৯২৩ দিয়ে গুণ করলে মানটা সঠিকের খুব কাছাকাছি যাবে।

হার্ট-অ্যাটাকের ব্যাপার-স্যাপার!

মেজকাকা ঘরে ঢুকতে বুবাই-টুবলু বলে উঠলো,–তোমাকে বড় পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে আজ। সারারাত্রি রোগীর বাড়ি বসে ছিলে নাকি?

মেজকাকা বললেন,–পাড়ার লোক, রাতবিরেতে ডাকলে তো আর দরজা বন্ধ করে ঘুমোনো যায় না।

বুবাই বললো,– কি হয়েছিল?

ভদ্রলোককে আমি আগে থেকেই চিনতাম। হাইপ্রেশারে ভুগতেন।–আলমোড়া ভেঙে পিঠটা টান টান করেন মেজকাকা ঃ সুতরাং বুদ্ধিমানের মতো প্রাণেশকে খবর দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

–প্রাণেশ...মানে কার্ডিওলজিস্ট প্রাণেশকাকু?

–ঠিক তাই। সন্তুদের বাড়ি গিয়ে দেখি, যা সন্দেহ করেছি ঠিক তাই। স্টেথো বসিয়ে হার্টের শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

টুবলু বললো,–তখন তুমি কি করলে?

–করণীয় তখন একটাই। শ্বাস-প্রশ্বাস ও হার্টের গতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা।

বুবাই বললো,–এ পরিস্থিতিতে পড়লে কি করতে হবে বল দেখি।

–প্রথমতঃ রোগীকে শক্ত মেঝেতে শুইয়ে দিতে হবে। মাথায় বালিশ থাকবে না। হাটু ভাঁজ করে দিবি বা কাউকে বলবি, পা-টা তুলে ধরতে, যাতে পা-টা হার্টের লেভেলের ওপরে থাকে।

কিন্তু হার্ট-অ্যাটাক হলে তো নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চালু করানোও দরকার?–পাশ থেকে প্রশ্ন করে বুবাই।

–খুব ভাল হয়, যদি রোগীর নাকটা দুটো আঙুল দিয়ে বন্ধ করে মুখে মুখ লাগিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস চালানোর চেষ্টা করা যায়। বুক ভরে দম নিয়ে জোরে দম ছাড়তে হবে রোগীর মুখে, দেখবি বুকের খাঁচাটা ফুলে উঠবে, অর্থাৎ ফুসফুসে হাওয়া ঢুকলো। এটা করতে হবে মিনিটে বার বিশেক।

টুবলু বললো,–এতো শ্বাস-প্রশ্বাসের বিকল্প ব্যবস্থা হলো। কিন্তু হার্ট?

–তার জন্যেও বিশেষ ব্যবস্থা আছে। হার্ট যদি থেমে যায়, প্রথমেই

একটা ঘুষি মারতে হবে বুকের বাঁদিকে হার্ট বরাবর। এরপর 'ম্যাসেজ' আছে।

বুবাই বললো,–বুঝবো কি করে যে কোন্ জায়গাটা ম্যাসেজ করা দরকার ?

মেজকাকা উত্তর দিলেন,–বুকের ঠিক মাঝ-বরাবর থাকে 'ব্রেস্ট-বোন'। 'ব্রেস্ট-বোনের' ইঞ্চি তিনেক ওপরে হার্ট বরাবর বাঁ-হাতটা রাখতে হবে। হাতের আঙুল থাকবে থুতনির দিকে, কব্জি পেটের দিকে। এবার ডান-হাত রাখতে হবে বাঁ-হাতের ওপর উপুড় করে এমনভাবে যাতে ডান-হাতের কব্জি থাকে রোগীর থুতনির দিকে। শরীরের ভার দিয়ে 'ব্রেস্ট-বোনকে' চাপতে হবে, অন্তত সেটা যাতে ইঞ্চি দুয়েক নিচের দিকে নামে।

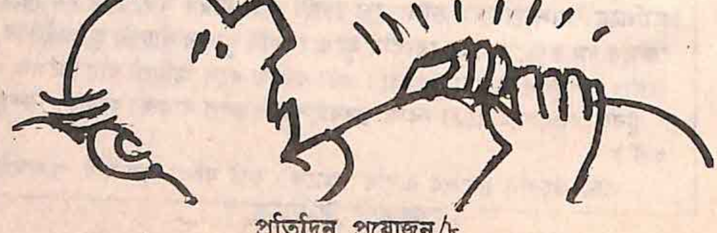
বুবাই বললো,–এতে লাভ ?

–চাপের জন্য রক্ত বেরিয়ে হার্ট থেকে ধমনীতে যাবে। বিশেষ করে ফুসফুসে আর মাথায়। কৃত্রিমভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে, ফলে ফুসফুসের মধ্যের অক্সিজেন মিশবে রক্তে। হাতের চাপ ছাড়লে পাঁজরা আর পেশীদের স্থিতিস্থাপকতা গুণের জন্য তারা নিজেদের জায়গায় ফিরবে, হার্টের ওপর চাপ কমবে, মহাশিরা দিয়ে রক্ত ফিরবে হার্টে।

টুবলু বললো,–এই ম্যাসেজ চলবে কি হারে ?

মেজকাকা বললেন,–মিনিটে অন্ততঃ ষাট থেকে সত্তরবার। অবশ্য কিভাবে ম্যাসেজ করা দরকার, সেটা ডাক্তারবাবুর কাছে হাতে-কলমে শিখে নেওয়া উচিত, তা না হলে উল্টো বিপত্তি ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়। ডাক্তারবাবুকে বললে, তিনি আনন্দের সঙ্গে এটা শিখিয়ে দেবেন।

চা এসে গেছে ইতিমধ্যে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মেজকাকা বললেন,– তবে হ্যাঁ, একটা কথা সকলেরই মনে রাখা দরকার, বেশির ভাগ হার্ট-অ্যাটাক ঘটে রাত্রে। সুতরাং যাঁদের বয়স হয়েছে, তাঁদেরকে বুঝিয়ে বলা দরকার, রাত্রে বেশি খাওয়া ঠিক নয়।



পেটে যদি 'বিষ' যায়

সে দিন সকাল থেকেই হইচই। কি ব্যাপার?—পাশের বাড়ির ভোম্বল নাকি ইঁদুরমারা বিষ খেয়ে ফেলেছে। বাড়ি থেকে লোকজন তাকে ভর্তি করেছে হাসপাতালে। বিপদ কেটেছে কিনা বোঝা যাবে চব্বিশ ঘন্টা পার হলে।

ইচ্ছে করে বিষ না খেলেও অনেকসময় বিষ থেকে দুর্ঘটনা ঘটা বিচিত্র নয়, বিশেষতঃ বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়ে থাকলে। হাতের কাছে ওষুধের শিশি—লজেন্স ভেবে গোটাকয়েক মুখে পুরেছে বা নেল পালিশ রিমুভারের শিশি গলায় ঢেলেছে—এমন ঘটনা মোটেই বিরল নয়। বিষাক্ত কোন কিছু কেউ খেয়ে ফেলেছে এমন সন্দেহ হলে প্রাথমিক কর্তব্যই হলো হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু এমন অনেক সময় হয় যে চট্ করে ডাক্তারবাবুকে হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে করণীয় কি? এ প্রসঙ্গে দু-চারটে কথা জেনে রাখলে লাভ বই লোকসান নেই।

প্রথমেই দেখতে হবে, যে বিষটা পেটে গেছে, সেটার সম্পর্কে কিছু জানা যায় কিনা। খালি বা আধখালি শিশি বোতল যদি খুঁজে পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে সমাধানের রাস্তাটা সহজ, অবশ্য শিশির গায়ে যদি 'লেবেল' থাকে। বিষ পেটে যাবার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করা উচিত। অনেকে মনে করেন বিষক্রিয়ার প্রাথমিক চিকিৎসাই হচ্ছে বমি করিয়ে দেওয়া, কিন্তু ধারণাটা সবসময় বোধহয় ঠিক নয়। কী বিষ পেটে গেছে, তা বুঝতে না পারলে আধ গেলাস অল্প গরমজলে এক চা-চামচ 'ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডোট' মিশিয়ে খাইয়ে দেওয়া উচিত। এই 'ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডোট' জিনিসটা আর কিছুই না, একভাগ ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, একভাগ ট্যানিক অ্যাসিড এবং দু'ভাগ অ্যাকটিভেটেড চারকোলের মিশ্রণ। যে কোন ফার্মেসিস্টের দোকান থেকে এটা সহজেই বানিয়ে নেওয়া যায়।

যেসব ক্ষেত্রে বিষ পেটে যাওয়ার পর বমি করানো বারণ, সেগুলো হচ্ছে—

1) অ্যামোনিয়া
2) চূণ
3) কেরোসিন, পেট্রোল, বেনজিন, অ্যাসিড, তার্পিন তেল। যেসব ক্ষেত্রে বমি করানোর চেষ্টাটাই বাঞ্ছনীয়, তা হলো–
1) কীটনাশক, আগাছানাশক বা ইঁদুর মারা, আরশোলা মারার বিষ;
2) ফিনাইল বা ঐ ধরনের জীবাণুনাশক রাসায়নিক
3) বার্ণিশ বা নেলপালিশ রিমুভার, স্টোভে দেওয়ার স্পিরিট অর্থাৎ মিথানল;
- 4) ঘুমের বড়ি।

প্রথমে বরং জেনে নেওয়া যাক, যেখানে বমি করানো উচিত নয়, সেখানে করণীয় কি। যে জিনিসটা পেটে গেছে তা যদি ক্ষার জাতীয় হয়, অর্থাৎ চূন বা অ্যামোনিয়া, সেক্ষেত্রে রোগীকে কাপ খানিক আন্দাজ লেবুর জল, তেঁতুল জল বা লঘু ভিনিগারে দ্রবণ গিলিয়ে দিতে হবে। এর পর দু-তিনটে ডিম ভেঙে তার অ্যালবুমিন অংশ, অর্থাৎ কুসুম বাদ দিয়ে জলের মতো অংশটা গ্লাসখানেক দুধ বা জলে গুলে খাওয়ালে বিপদের আশংকা কমবে অনেকটাই। এরপর রোগী একটু সুস্থ বোধ করলে তাকে এককাপ চায়ের লিকার দিলে ঝিমুনিভাব কাটবে।

অ্যাসিড জাতীয় জিনিস হলে প্রথমে লেবুর জলের বদলে দিলে হবে আধ কাপ জলে আধ কাপ মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া মিশিয়ে অথবা এক গ্লাস জলে দু-চামচ সোডি-বাই-কার্বনেট বা খাবার সোডা মিশিয়ে প্রাথমিক শুশ্রূষার কাজটি শুরু করা যেতে পারে। এর পর চিকিৎসা পদ্ধতি একই–অর্থাৎ জল বা দুধে ডিমের সাদা গুলে খাওয়ানো।

কেরোসিন-পেট্রোলের ক্ষেত্রে টক বা খাবার-সোডা কোনটারই দরকার নেই। জলে বা দুধে-ডিম গুলে খাওয়ালে বিষক্রিয়া নষ্ট হবে অনেকটাই।

যেখানে বমি করানোর প্রয়োজন, সেখানে সব থেকে সহজ উপায় গ্লাস পিছু এক চা-চামচ হিসেবে নুন দিয়ে দু-তিন গ্লাস গরম জল খাওয়ানো। বমি করতে দেরি হলে গলায় আঙুল দিয়ে বমি করানো যেতে পারে। নুন জলের বদলে সাবান জল খাওয়ালেও একই ফল মিলবে। বমির সময় দেখতে হবে মাথা যাতে শরীর থেকে সমানে ঝুঁকে থাকে, না হলে শ্বাসনালী অবরোধ হয়ে বিপদ্ বাড়াবে। বমির রঙ লক্ষ্য করা দরকার। যদি একবারে বমির রঙ স্বচ্ছ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আর বমি করানোর

প্রয়োজন নেই ; কিন্তু বমি কালচে, অস্বচ্ছ বা তার সঙ্গে খাবারের টুকরো উঠলে আবার বমি করাতে হবে।

আয়োডিন খেয়ে ফেললে বমি করানোর আগে জলে পাঁউরুটি বা ময়দা গুলে খাওয়ালে আয়োডিনের বিষক্রিয়া কমে।

বমি হয়ে যাবার পর আধ গেলাস জলে এক চামচ ইউনিভার্সাল-অ্যান্টিডোট মিশিয়ে খাইয়ে দিতে পারলে ভাল; বিষাক্ত জিনিসের অংশবিশেষ পেটে থেকে গেলেও তা প্রশমিত হবে।

ঘুমের বড়ির ক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসার পদ্ধতি একই—তবে বমি হয়ে যাওয়ার পর মাঝে মাঝে চায়ের লিকার খাইয়ে রোগীকে চাঙ্গা রাখতে হবে, ঝিমিয়ে পড়তে দেওয়া চলবে না, অন্ততঃ যতক্ষণ না ডাক্তারবাবু এসে পৌঁছোন।

শেষে একটা কথা বলি—প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করার আগে কয়েকটা জিনিস লক্ষ্য করা খুব দরকারী। এক—রোগীর জ্ঞান আছে কি না, দুই—নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস অনিয়মিত কি না এবং তিন—শরীরের তাপমাত্রার বিশেষ কোন হেরফের হয়েছে না কি। এসব ক্ষেত্রে যতই অসুবিধে থাকুক না কেন, রোগীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে পৌঁছোতেই হবে।



হঠাৎ যদি কেটে যায়

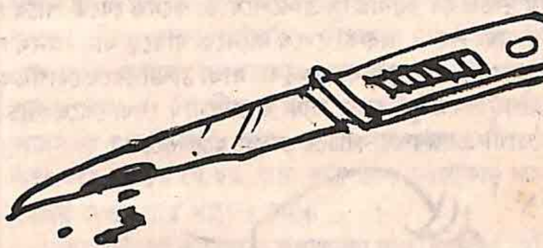
খেলা করতে করতে বুবুনের ছোট্ট ভাইটা হামা দিয়ে ঢুকে পড়েছিল রান্নাঘরে। ঠাকুমা তরকারি কাটছিলেন, বোধহয় একটু অন্যমনস্কও ছিলেন। কাটতে থাকা টমেটোটাকে লাল বল ভেবে টুবলু যেই না ধরতে গেছে সেটাকে—আর যাবে কোথায়। আঙুল পড়েছে বঁটির ওপর, একেবারে রক্তারক্তি কান্ড!

ছোটখাট কাটা-ছেঁড়া আমাদের গা সওয়া হলেও বড় ধরনের রক্তপাত দেখলে ঘাবড়ে যান অনেকেই। সময়মতো রক্ত পড়া বন্ধ করতে না পারলে তার ফল বিপদ-জনক হতে পারে, বাচ্চাদের পক্ষে তো বটেই। রক্তপাত ঘটে রক্তবহা নালী ছিঁড়ে বা কেটে যাওয়ার সূত্রে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেটে গেলে চামড়ার ঠিক নীচের রক্তজাল বা ক্যাপিলারি ছিঁড়ে রক্ত বেরিয়ে আসে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে রক্তপড়া বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বড়সড় রক্তনালী যেমন শিরা বা ধমনী কাটলে রক্তপাত হবে বড়সড়। শিরা কাটলে রক্ত বেরিয়ে আসে গলগল করে একটানা। রক্তের রঙ কালচে লাল। ধমনী কাটলে রক্ত বেরোয় ফিনকি দিয়ে, ছিটকে। টক্‌টকে লাল রক্ত।

ছোট মাপের কাটা হলে শরীরের 'তঞ্চন-ব্যবস্থা' অবস্থাটা সামাল দিয়ে নেয়—রক্ত জমাট বেঁধে কাটা জায়গার মুখে 'ছিপির' কাজ করে। কিন্তু বড়োসড়ো কাটার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ রক্ত যেখানে বেরিয়ে আসছে খুব জোরে, সেক্ষেত্রে জমাট-বাঁধা রক্তের ডেলা রক্তনালীর মুখে আটকে থাকতে পারে না। এক্ষেত্রে হাসপাতালের 'ইমারজেন্সী' বিভাগের শরণাপন্ন না হলে রোগীর জীবন সংশয় হওয়াও বিচিত্র নয়। বাড়ি থেকে হাসপাতাল—এই সময়টা যাতে রক্তপাত কমানো বা বন্ধ করা যায়, তার জন্য দু-একটা চট্‌জলদি উপায় আছে। প্রথমেই দরকার একটা বাঁধন এবং যে জায়গাটা কেটেছে সেটা খানিকটা উঁচুতে রাখা। উদ্দেশ্য—রক্তটা যাতে হার্টের দিকে ফেরে চট্‌পট এবং কাটাটা যদি হার্টের থেকে বেশি উচ্চতায় থাকে সেক্ষেত্রে হার্টকে পাম্প করতে হবে অভিকর্ষের বিরুদ্ধে। ফলে রক্ত বেরিয়ে আসার জোরটা কমবে অনেকটাই।

অনেক সময় হাতের কাছে বাঁধন খুঁজে পাওয়া যায় না চট্ করে, খুঁজতে

সময় লেগে যায় খানিকটা। চট্‌জলদি রক্তপড়া আটকানোর একটা সহজ উপায় হলো কাটা রক্তনালীর খানিকটা ওপরে চাপ দিয়ে ঐ রাস্তায় রক্ত চলাচল অস্থায়ীভাবে বন্ধ রাখা। হাত বা পায়ের নীচের দিকে কাটলে কনুই বা হাঁটু বরাবর ভাঁজ করে চাপ দিয়ে রাখলে উপকার পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই। এছাড়া শরীরে কয়েকটি 'প্রেশার পয়েন্ট' আছে, যেগুলোর ওপর আঙুল দিয়ে চেপে ধরলে খানিকক্ষণ রক্তপড়া বন্ধ করে রাখা যায়। মনে রাখতে হবে, এই জায়গাগুলোতে চাপ দিতে হবে শুধুমাত্র ধমনী থেকে রক্তপাতের ক্ষেত্রে। মাথা বা ঘাড়ের কোন ধমনী থেকে রক্তপাতের ক্ষেত্রে ক্যারোটিড ধমনী থেকে রক্তপাত বন্ধ করতে হবে, হাতের রক্তবাহী ধমনীর ক্ষেত্রে চাপ দিতে হবে সাবক্লেভিয়ান ধমনীতে ব্রেকিয়াল ধমনীতে (হাতের বাইরের দিক বা ভেতরের দিক অনুসারে);



পায়ের রক্তচাপের ক্ষেত্রে প্রেশার পয়েন্টটি খুঁজে নিতে হবে ফিমোরাল-ধমনীর ওপর, থাই-এর ভেতরদিক বরাবর।

বাঁধন খুঁজে পেতে দেরি হলে চিন্তা করে বিকল্প কিছু খুঁজতে হবে– বেল্ট, রবারের সরু টিউব, দড়ি, গামছা, নেকটাই যাই হোক। কাপড়ের বাঁধন শক্ত করতে গিঁট দেওয়ার সময় ছোট লম্বা কাঠের টুকরো বা পেনসিল দিয়ে স্ক্রু-র মতো প্রথমে প্যাঁচ দিয়ে নিলে বাঁধন টাইট হবে, কার্যকরও হবে বটে।

বাঁধন পর্বের পর ব্যান্ডেজের পালা। ব্যান্ডেজের পক্ষে আদর্শ হলো 'গজ-তুলো'। ওষুধের দোকানে 'গজে'র ছোট ছোট প্যাকেট পাওয়া যায়। এগুলো ঘরে দু-চারটে সবসময় রাখা দরকার। ব্যান্ডেজ দেওয়ার সময় দু-একটা কথা মাথায় রাখতে হবে। প্রথমতঃ ব্যান্ডেজ দেওয়ার

প্রাথমিক উদ্দেশ্যই হচ্ছে ক্ষতস্থানটিকে ঢেকে রাখা। সুতরাং প্যাকেট থেকে ব্যাণ্ডেজ বার করার সময় খেয়াল রাখা প্রয়োজন যাতে ব্যাণ্ডেজের যে অংশটি ক্ষতস্থানের ওপর পড়ছে, সে অংশে ধূলোময়লা না থাকে। ঘরে গজ-ব্যাণ্ডেজ না থাকলে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে পরিষ্কার ধুতি বা শাড়ীর অংশ ছিঁড়ে তা দিয়েও ব্যাণ্ডেজ দেওয়া যায়। খুব ভাল হয় যদি বাঁধার আগে কাপড়ের টুকরোটার ওপর একবার গরম ইস্ত্রি বুলিয়ে নেওয়া যায়। কাপড়কে জীবাণুমুক্ত করার এটাই সহজতম উপায়।

কেটে গিয়ে রক্তপাতের সঙ্গে অনেক সময় একটা বাড়তি সমস্যা জুটে যায়। সেটা হলো অজ্ঞান হয়ে পড়ার সমস্যা। অনেকেরই কাটাকুটি, রক্তপাত দেখলে মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে, গা-গুলিয়ে যায়, হয়তো বা চেতনাও লোপ পায়। মূলতঃ এর জন্য দায়ী ভয়। দেখা গেছে ঐ সময় রোগীর ঘাম দেয়, হাত-পা ঠাণ্ডাহয়ে আসে, রক্তচাপ কমে যায়, পালস্ বা নাড়ীর গতি হয় দ্রুততর। আবার ক্ষেত্রবিশেষে তা কমেও যেতে পারে। পরিভাষায় এর নাম 'শক্'। অবস্থা দেখে অনেকে ঘাবড়ে যান—অনর্থক ছোটাছুটি শুরু করেন। এখানে প্রধান কর্তব্য—মাথা ঠাণ্ডা রেখে রোগীকে সাহস দেওয়া, একটু গরম দুধ বা চা-কফি খাওয়ানো। দেখা গেছে পাঁচ-দশ মিনিটেই রোগী এ অবস্থা কাটিয়ে চাঙ্গা হয়ে ওঠেন।



হুল

সকালের সময়–এমনিতেই তাড়া-হুড়ো। রান্নাঘরের দিকে চ্যাচামেচি শুনে পা বাড়ায় সন্তু। কি ব্যাপার–না মাছ কাটতে গিয়ে বিপত্তি। হাঁড়িতে সিঙিমাছ জিয়োনো ছিল, তুলতে গিয়ে আচমকা কাঁটা বিঁধিয়েছে রেণুদিদির হাতে। বাঁ-হাত দিয়ে ডান হাত চেপে বসে পড়েছে রেণুদিদি। আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে আসছে রক্ত।...

অথচ ওরকম ঘটনা আকছারই ঘটে থাকে। মাছ কাটতে গিয়ে বিপত্তি ঘটায় সিঙি, ট্যাংরা, কই, মাগুর। গ্রীষ্মের রাতে খোলার চাল থেকে নেমে বিছানায় ঢোকে কাঁকড়া বিছে। ছুটির দুপুরে আম পাড়তে গিয়ে দুষ্টু ছেলের ঢিল লাগে মৌমাছি, ভীমরুল, বোলতার চাকে। মৌমাছি-বোলতার কামড়ে নাস্তানাবুদ হতে হয় অনেক সময়ই। অসাবধানে শুয়োপোকা বা বিছুটির জ্বালায় নাকাল হওয়ার অভিজ্ঞতা কমবেশি আমাদের প্রত্যেকেরই আছে। আর বর্ষাকালে মেঠো রাস্তায় পা-ঠুকে শব্দ করে চলতে যে হয়, তার কারণটাও সবাইকার জানা। কথায় বলে বাঘের দেখা আর সাপের লেখা...

যেসব উটকো ঝামেলার কথাগুলো বললাম, তার বেশির ভাগই দেখা যায় ঘটে এমন সময়, যখন হাতের কাছে ডাক্তার মেলে না, ঘটে ভোগান্তির একশেষ। সাপের কথা বাদ দিলেও, বিষাক্ত কাঁকড়াবিছের কামড়ে ছোট ছেলেমেয়ের জীবন-সংশয় হয়েছে, এমন ঘটনাও বিরল নয়। অথচ একটু সাধারণ বুদ্ধি খাটালে কষ্ট-যন্ত্রণা কমানো যায় অনেকটাই। প্রথমে বরং কাঁকড়াবিছের প্রসঙ্গেই আসা যাক। কাঁকড়াবিছে থাকে জঙ্গলের স্তূপে, ভাঙা জিনিসপত্রের আড়ালে, খোলার চালায়–শুকনো জায়গায়। সুতরাং ঐসব জায়গায় হাত দেবার আগে সাবধান অসাবধানে যদি কামড় দিয়েও দেয়, তবে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। কাঁকড়াবিছে কামড়ায় সাধারণতঃ হাতে বা পায়ে। যে জায়গাটায় কামড়েছে, তার ইঞ্চি দেড়েক ওপরে একটা বাঁধন দেওয়া জরুরী। এবং তা করতে হবে সঙ্গে সঙ্গেই। কাঁকড়াবিছের হুল থাকে ল্যাজে, ল্যাজ ঘুরিয়ে হুল ফোটায় ওরা। ইঞ্জেকশনের মতো হুলের কাঁটা থেকে বিষ মেশে রক্তে। যন্ত্রণা শুরু হয় দু' থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে। বেঁধে দেওয়ার পর খুব ভাল হয়

যদি আঙুলটা বরফজলে ডোবান যায়। দু-তিন মিনিট পর পর আঙুলটা তোলা যেতে পারে, আবার ডোবাতে হবে তা। বিশ-পঁচিশ মিনিট পর পর বাঁধন একটু ঢিলে দিয়ে তা আবার বাঁধতে হবে কষে। ইতিমধ্যে রোগীকে একটু গরম দুধ বা চা দেওয়া যেতে পারে; ব্যথা-কমানোর জন্যে অ্যাসপিরিন বা ঐ জাতীয় কোন ব্যথানাশক বড়ি গোটা দুয়েক। বিছেটাকে মারতে পারলে ভাল হয়। কারণ ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বিষের যন্ত্রণা হতে পারে মারাত্মক, তখন ছুটতে হবে হাসপাতালে। মরা-বিছেটা নিয়ে গেলে ডাক্তারবাবুদের সুবিধে। কারণ সাপের বিষের মতো বিছের বিষেরও দাওয়াই অ্যান্টি-ভেনিন।

অনেক সময় দেখা যায় রাস্তার মোড়ে হাত এক ধরনের আংটি পরে হাতে কাঁকড়বিছে তুলে নেয় একশ্রেণীর লোকঠকানো ব্যবসাদার; তাদের বক্তব্য ঐ আংটি পরলে কাঁকড়া বিছে নাকি কামড়ায় না। একদম বাজে কথা, ভুলেও ঐ প্রলোভনে পা দেওয়া নয়। তাদের কাঁকড়াবিছের হুল ভাঙা থাকে। বাড়ির আশেপাশে ঘুরে বেড়ানো কাঁকাড়াবিছের কিন্তু হুল-ভাঙা থাকে না।

কাঁকড়াবিছের কামড়ের মতো একইভাবে করা দরকার সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসা। কামড়ানোর জায়গায় বরফ হয়তো নাও দেওয়া যেতে পারে—কিন্তু বাঁধন দিতে হবে অবশ্যই অবশ্যই। বাঁধা জায়গা ব্লেড দিয়ে চিরে দেওয়া, লোহা পুড়িয়ে ছ্যাঁকা, তুকতাক, ওঝা গুণীন—কখনোই না, কোন অবস্থাতেই না। ব্যথা কমানোর বড়ি খাইয়ে রোগীকে নিয়ে যেতে হবে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা হাসপাতালে, অ্যান্টিভেনিন চিকিৎসার জন্য।

হুলের যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়ার কথা বলতে গিয়ে, শুরু করেছিলুম রেণুদিদির হাতে সিংগমাছের কাঁটা বিঁধোনোর কথা বলে। কিন্তু কাঁকড়াবিছের পাকানো ল্যাজের ওপরের হুলটা চোখের সামনে এমনভাবে ভেসে উঠলো যে, গোড়ার কথাই বলা হয়নি। এবার আসি সেই কথায়।

সিঙ্গি, ট্যাংরা বা মাগুরমাছ কাঁটা মারলে বরফ জলে আঙুল ডুবিয়ে রাখলে রক্ত চলাচল কমে, ফলে ব্যথার অনুভূতিও হয় কম। বাজারে ২ শতাংশ 'জাইলোকেন' মলম পাওয়া যায়। এটা স্থানীয়ভাবে জায়গাটা অবশ করে। আর অসাড় জায়গা থেকে ব্যথার অনুভূতিও মগজে পৌঁছোয় কম।

তবে ব্যথার মতো সমস্যাটা প্রকট না হলেও চুলকানিও কম সমস্যা সৃষ্টি করে না। অসাবধানে হাতে বিছুটি বা শুঁয়োপোকার শুঁয়ো লেগে

প্রচন্ড অস্বস্তির অভিজ্ঞতা কম বেশি সকলেরই আছে।

বিছুটির রোমের বাইরের গায়ে থাকে সিলিকাঘটিত লবণের দানা। যা চট্ করে চামড়ায় বেঁধে। বিছুটি গাছের কোষে থাকে 'ফরমিক অ্যাসিড', যা চামড়ায় জ্বালা ধরায়। এই ফরমিক অ্যাসিড থাকে পিঁপড়ের হুলেও। হালকা চূনের প্রলেপ ফরমিক অ্যাসিডের জ্বালা কমায় অনেকটাই। অবশ্য ফরমিক অ্যাসিড চামড়ার নিচে কিছু স্থানীয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, 'টিস্যু' বা কোষকলা থেকে বেরিয়ে আসে 'হিস্টামাইন' জাতীয় কিছু রাসায়নিক পদার্থ, পরিভাষায় যাদের নাম অটাকয়েডস্। এদের ক্রিয়ায় চামড়ার নিচে রক্ত চলাচল বাড়ে, জায়গাটা ফুলে ওঠে লাল হয়ে! এখানে সঙ্গে সঙ্গে যদি অ্যান্টি হিস্টামাইন জাতীয় লোসান লাগানো যায় তাহলে উপকারে মিলবে হাতে হাতে নাতে।

শুঁয়োপোকার শুঁয়োও একইভাবে বেশি গভীরে যায় না। শুঁয়োর জ্বালা কমানোর একট সহজ টোটকা উপায় আছে। তা হলো–যেখানে শুঁয়ো লেগেছে, সে জায়গায় হালকা ভাবে চূনের প্রলেপ দিয়ে একটু অপেক্ষা করা। চূন শুকিয়ে গেলে শুঁয়োগুলো তার সঙ্গে এঁটে বসে; হালকা হাতে একটা ব্লেড বা ঐ জাতীয় কিছু দিয়ে চূনের প্রলেপটা চেঁছে ফেললে শুঁয়োগুলোও সঙ্গে সঙ্গে ঝরে যায়। তবে সাবধান, ব্লেডের ধারে চামড়া না কাটে।

মৌমাছি, বোলতা, ভীমরুলের কামড়ের যন্ত্রণাও কম নয়। এবার তাদের প্রতিবিধানের কথা বলি।

মৌমাছি, বোলতা, ভীমরুলের কামড় আপাতভাবে এক ধরনের মনে হলেও এদের বিষের রকম কিন্তু একদম বিপরীত। মৌমাছির বিষ অ্যাসিড ধর্মী, কিন্তু বোলতা বা ভীমরুলের বিষের ধর্ম ক্ষারীয়। সুতরাং মৌমাছি কামড়ালে যদি একটু চূন বা অ্যামোনিয়া দেওয়া যায়, সেক্ষেত্রে জ্বালা কমবে তৎক্ষণাৎ। কিন্তু বোলতা বা ভীমরুল কামড়ালে সেখানে প্রয়োগ করা দরকার অ্যাসিড ধর্মী কোন রাসায়নিক যেমন, ভিনিগার, লেবু বা তেঁতুল জল। রসায়নের প্রাথমিক জ্ঞান বলে–অ্যাসিডকে প্রশমিত করে ক্ষার, ক্ষারকে প্রশমিত করবে কিন্তু অ্যাসিডই!



ওষুধ খাওয়ার হরেক নিয়ম

অসুখ করলে ওষুধ খেতে হয়–এ কথা সব্বাই জানে। কিন্তু সব ওষুধ যে সব সময় খাওয়া যায় না, অথবা বিশেষ বিশেষ ওষুধের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ খাবার খাওয়া মানা–এ কথাগুলো আমরা খেয়াল করি না আদৌ।

টেট্রাসাইক্লিন–এটা একটা অতি পরিচিত অ্যান্টিবায়োটিক। এই ওষুধটি যতদিন খাওয়া হবে, ততদিন কিন্তু দুধ খাওয়া উচিত না। দুধের উপস্থিতিতে টেট্রাসাইক্লিন অন্ত্রে শোষিত হয় না, ফলে উপকারও হয় না আদৌ!

ঠিক তেমনি সাবধান হতে হবে কৃমিনাশক ওষুধের ব্যাপারেও। যেদিন রাতে কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়ানো হবে, সেইদিন ও পরের দিন বেশি মাখন বা তেল জাতীয় জিনিস, খাবার থেকে বাদ। স্নেহপদার্থ কৃমিনাশক ওষুধের কার্যকারিতা নষ্ট করে।

বাড়িতে অনেকেরই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আত্মীয় স্বজন থাকেন। তাঁদের কেউ কেউ হয়তো হার্টের অসুখে ভোগেন। হার্টের অসুখের জন্য নিয়মিত যাঁরা ওষুধ খান, তাঁদের অন্য যেকোন অসুখের জন্য ওষুধ খাবার আগে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। বিশেষতঃ কাশির সিরাপ। এতে অনেক সময়ই 'এফিড্রিন' ধরনের উপাদান থাকে–যা হার্টের রোগীদের পক্ষে মারাত্মক।

ঠিক একই কথা প্রযোজ্য, যারা লিভারের কোন অসুখে ভুগছে বা ভুগে উঠেছে। জনডিসের রোগীরা ওষুধ খাবে খুব সাবধানে–কারণ অধিকাংশ ওষুধ-ই নিষ্ক্রিয় হয় যকৃৎ বা লিভারে। আর জনডিসের উপসর্গ যাদের আছে, তাদের অধিকাংশেরই লিভারের কোষগুলো হয়ে পড়ে কমজোরি।

অ্যান্টিবায়োটিক ধরনের ওষুধ প্রায়ই বাজারে পাওয়া যায় 250 mg., 500 mg., এমনি বিভিন্ন মাত্রায়। ডাক্তারবাবু হয়তো লিখে দিলেন: 250 mg.–এর বড়ি দিনে চারবার। হয়তো পাড়ার দোকানে গিয়ে 250 mg. মাত্রার ওষুধটা পাওয়া গেল না। নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে কেউ হয়তো 500 mg. মাত্রায় ওষুধ কিনে আনলো, দিনে চার বারের জায়গায় দু-বার

খেলেই চলবে–এই ভেবে। অথচ ডাক্তারবাবু হয়তো ভেবেচিন্তেই ঐ 250 mg. মাত্রাটা ঠিক করেছেন–কারণ ঐ বিশেষ অসুখে হয়তো রক্তে অ্যান্টিবায়োটিকের মাত্রা কয়েকদিনের জন্য চব্বিশ ঘণ্টাই বেশি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু 500 mg. মাত্রায় দিনে দু-বার ওষুধটা খেলে, রক্তে অ্যান্টিবায়োটিকের মাত্রা বারবার ওঠানামা করবে। কারণ সাধারণতঃ একটা ওষুধ খাওয়ার পর তার মাত্রা রক্তে বাড়ে ধীরে ধীরে–মাত্রাটা স্থির থাকে চার-পাঁচ ঘণ্টা, তারপর মাত্রাটা জেনে বুঝেই ডাক্তারবাবু 250 mg. হিসেবে দিনে চারবার ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। সুতরাং সেক্ষেত্রে দিনে দু'বারে ওষুধটা কমিয়ে দেওয়া কি যুক্তিযুক্ত?

অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার ব্যাপারে অনেকেরই আর একটা বদ অভ্যেস

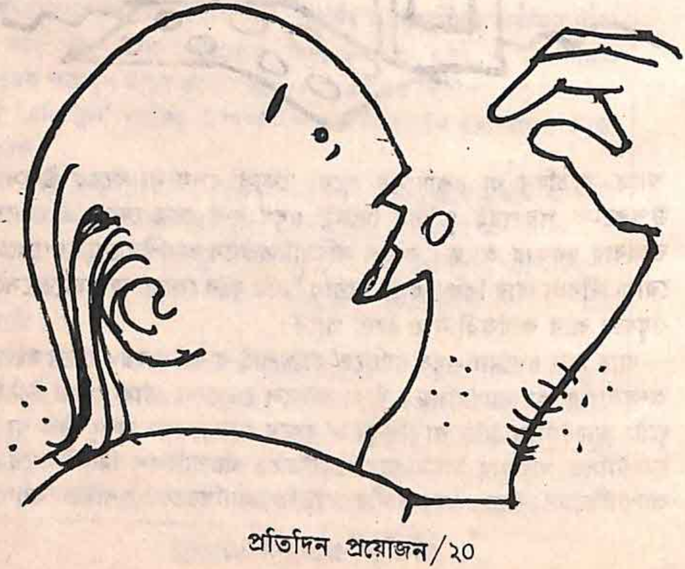


আছে–সাতদিন বা দশদিনের পুরো 'কোর্স' শেষ না করেই উপসর্গ উপশমের পরপরই দু-তিন দিনেই ওষুধ বন্ধ করে দেন। এ ক্ষেত্রে ভাববার দরকার আছে। কারণ অনিয়মিতভাবে অ্যান্টিবায়োটিক খেলে রোগ-জীবাণু তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরি করে ফেলে–ভবিষ্যতে সেই ওষুধটা আর কার্যকরী নাও হতে পারে।

আর এক ধরনের ওষুধ বাড়িতে হামেশাই ব্যবহার হয়। সেটা হলো অম্লনাশক বা অ্যান্টাসিড। যাঁরা অম্বলে ভোগেন, তাঁরা খেয়ে উঠেই দুটো অ্যান্টাসিড বড়ি বা 'লিকুইড' খেয়ে নেন। এটা কিন্তু ঠিক না। অ্যান্টাসিড খাওয়ার নিয়ম খাবার অন্ততঃ পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে। অ্যান্টাসিডের কাজ পাকস্থলীর বাড়তি অ্যাসিডকে প্রশমিত করা।

পাকস্হলীতে অ্যাসিডের পরিমাণ বাড়তে থাকে খাবার আধ ঘন্টা পর থেকে। এর আগে ওষুধ খেলে পাকস্হলীর অ্যাসিডের পরিমাণ কমে যাবে ভীষণভাবে–যেটা হজমের পক্ষে ক্ষতিকর।

ওষুধ খাওয়ার ব্যাপারে একটা সাধারণ নিয়ম আছে–তা হলো খালি পেটে ওষুধ না খাওয়া। ওষুধ, বিশেষতঃ ব্যথানাশক ওষুধগুলো পাকস্হলীকে উত্তেজিত করে অ্যাসিডক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়। যাঁদের অম্বলের কষ্ট আছে, তাঁদের পক্ষে ফল হবে মারাত্মক–কষ্ট বেড়ে যাবে বহুগুণ। সেক্ষেত্রে কিছু খেয়ে ওষুধ খেলে বাড়তি অ্যাসিডটাকে প্রশমিত করার দায়িত্ব নেবে ঐ খাবারের টুকরো বা মন্ডগুলো। তবে নিপাতনে সিদ্ধও যে নেই তা নয়–কিছু কিছু ওষুধ খাবার নিয়ম একেবারে খালি পেটে। এর মধ্যে আছে পেনিসিলিন, ট্রিপসিন-কাইমোট্রিপসিন ধরনের ওষুধ। এগুলোর মধ্যে পেনিসিলিনের হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক এবং ট্রিপসিন-কাইমোট্রিপসিনের ব্যবহার ফুলো-ব্যথা, অপারেশনের পর সেই জায়গায় জল-জমা কমাতে ইত্যাদি। এগুলো খালিপেটে খাওয়ার পেছনে যুক্তি একটাই–খাবার পর পাকস্হলী ও অন্ত্রের হজমীরসের বাড়তি ক্ষরণ যাতে না ওষুধের অণুগুলোকেই ভেঙে বসে!



ওষুধ খাওয়ার রকমফের

অসুখ করলে ওষুধ খেতে হয়–এ কথা সবারই জানা। বিশেষ বিশেষ ওষুধের ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ বিধি-নিষেধ আছে, সে ব্যাপারে আগেই বললাম। তবে ওষুধ খাওয়ার ব্যাপারে আপত্তি করেন অনেকেই। যেমন–বড়ি বা ট্যাবলেট কোনক্রমে গলা দিয়ে গললেও ক্যাপসুল খেতে অনীহা অনেকেরই থাকে।

ক্যাপসুল গিললে জলটা নেমে যায়, ওষুধটা থেকে যায় মুখের মধ্যে। ক্যাপসুলের মোড়কটা জিলাটিন ধরনের জিনিস দিয়ে তৈরি–জলের সংস্পর্শে সেটা চট্‌চটে হয়ে যায়, ভেতরের ওষুধটা ভয়ানক তেতো; সব মিলিয়ে এক বিচ্ছিরি অবস্থা!

কি করে চট্ করে ক্যাপসুল গেলা যায়, তা বলার আগে বরং বলে নি–ক্ষেত্রবিশেষ ডাক্তারবাবুরা ক্যাপসুল খাওয়ার পরামর্শ দেন কেন? ক্যাপসুলের বিভিন্ন মাত্রা থাকে–250, 300, 500 ইত্যাদি। এগুলো সবই মিলিগ্রামের হিসেব। আমরা সাধারণতঃ বলি, ক্যাপসুল মানে কড়া-ওষুধ। কথাটা খানিকটা ঠিকই। কেন না ট্যাবলেট বা বড়ির তুলনায় ক্যাপসুলের ভেতর কার্যকরী ওষুধ পোরা থাকে বেশী মাত্রায়। সেরকম অসুখের ক্ষেত্রে শরীরে ওষুধের প্রয়োজন হয় বেশী–তখনই ডাক্তারবাবুরা লেখেন ক্যাপসুলের ব্যবস্থা পত্র।

ট্যাবলেটে কার্যকরী ওষুধের পরিমাণ কম, তাও মেশানো থাকে স্টার্চ বা ঐ জাতীয় কোন 'বাইন্ডারে'র সঙ্গে। ট্যাবলেটে 500 মিলিগ্রাম কার্যকরী ওষুধ দিতে হলে দরকার বেশী বাইন্ডার। সেক্ষেত্রে ট্যাবলেটের 'সাইজ' হয়ে পড়তো বিশাল। গলা দিয়ে নামানোও হতো মুশকিল। আবার কোন কোন সময় এমন ওষুধ শরীরে পাঠানোর দরকার পড়ে, যেটার কার্যকারিতা পাকস্থলীর অ্যাসিড-মাধ্যমে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ওষুধের ওপরের আবরণটা গলানো দরকার 'পাকস্থলী' পার করে–অন্ত্রের ভেতর। দেখা গেছে এই ধরনের বিশেষ মোড়ক ক্যাপসুলের আকারে দেওয়াই সুবিধেজনক।

কিন্তু ক্যাপসুল গেলার সবথেকে বড় অসুবিধে হচ্ছে, তা মুখের ভেতর ভেসে থাকে, খাদ্যনালীর দিকে যেতে চায় না আদৌ! এর কারণ আর

কিছুই নয়, ক্যাপসুলের ভেতর 'বাইন্ডার' না থাকায় ক্যাপসুল হয় হাল্‌কা–তা ভেসে ওঠে জলের ওপর। এখন এই জ্ঞানটাকে ভিত্তি করে ক্যাপসুল গেলার সহজ উপায় কিন্তু চিন্তা করা যায়।

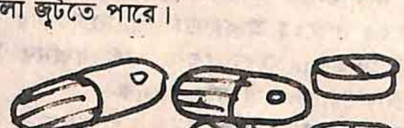
ট্যাবলেট গেলার সময় আমরা কি করি ? মুখে জল নিয়ে ঘাড়টা পেছনে হেলিয়ে দিই। তারপর ট্যাবলেটটা টুক্‌ করে ফেলি মুখের ভেতর। ক্যাপসুলের ক্ষেত্রে কিন্তু এ নিয়ম খাটবে না। প্রথমে মুখে জল নিতে হবে, তারপর ক্যাপসুল জিভের ওপর ফেলে মুখটা বন্ধ করে ঘাড় ঝুঁকিয়ে দিতে হবে সামনের দিকে। যেহেতু ক্যাপসুল হাল্‌কা, স্বাভাবিক নিয়মেই এবার সেটা ভেসে উঠবে। কিন্তু মাথা সামনে হেলানোর দরুণ তা ভেসে উঠবে মুখের পেছন দিকে। এবার ঐ অবস্থায় জলটা গিলে ফেললেই ক্যাপসুল গলা দিয়ে নেমে যাবে চট্‌ করে–কোনো ভোগান্তি ছাড়াই।

তবে হ্যাঁ–মুখে ক্যাপসুল আর জল বেশীক্ষণ রাখা চলবে না, সেক্ষেত্রে আবরণী গলে গিয়ে ওষুধ ছড়িয়ে সারা মুখ তেতো করে দেবে।

তেতো স্বাদের কথায় আমাদের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায়। তখন জ্বর হলেই তেতো-'মিক্সচার' খেতে হতো। মাঝে মাঝেই মা-দিদিমারা চিরতা, কালমেঘ গিলিয়ে দিতেন। আমাদের সে ব্যাপারে ছিল ঘোরতর আপত্তি। শেষমেষ তেতো স্বাদের হাত থেকে পরিত্রাণের উপায়টা বাতলে দিয়েছিলেন এক ডাক্তারমামা।

উপায়টা আর কিছুই না–তেতো মিক্সচার মুখে ঢালার ঠিক আগের মুহূর্তে, এক চিমটে পিপারমেন্টের গুঁড়ো জিভে ফেলে নেওয়া। পিপারমেন্টের তীব্র ঝাঁঝ কয়েক সেকেন্ডের জন্য স্বাদের 'বোধটা' আচ্ছন্ন করে রাখে। সেই ফাঁকে তেতো ওষুধটা গিলে ফেলা আর এমন কি ?

পিপারমেন্ট গুঁড়োর আর একটা বিকল্প আছে। তা হলো এক টুকরো বরফ খানিকক্ষণ চুষে নেওয়া। এখানেও ব্যাপারটা একই হবে। এটা কালমেঘ বা চিরতর জল খাওয়ার আগে করে দেখা যেতে পারে। তবে জ্বর-জ্বারির ক্ষেত্রে বরফের টুকরো না চোষাই ভাল, সেক্ষেত্রে ঠান্ডা থেকে বাড়তি ঝামেলা জুটতে পারে।



হঠাৎ পুড়ে গেলে.....

টিভির দৌলতে বিজ্ঞাপনটা প্রায় সকলেরই দেখা। জামাকাপড় ইস্ত্রি করছেন মা–পাশের ঘর থেকে দৌড়ে এলো ছোট্ট মেয়েটা। কেউ কিছু বোঝার আগেই গরম ইস্ত্রিতে লাগল হাত।........পরের দৃশ্যঃ ফোস্কা ওঠা হাতে হাসিমুখে ওষুধ লাগাচ্ছেন মা!

আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বেই। এ সহজ সত্যিটা আমরা সবাই জানি অথচ আগুনে ছোট বা বড় দুর্ঘটনার অভিজ্ঞতাও আমাদের প্রত্যেকেরই আছে। আর এই বিপদ এড়ানো সত্যই শক্ত–কারণ আগুনজনিত দুর্ঘটনা কখন কিভাবে এসে পড়বে তার আগাম হদিস মেলা ভার। রাস্তার মোড়ে দড়ির আগুনে সিগারেট জ্বালাতে গিয়ে আঙুল পোড়ালেন রন্টুর বাবা; রঙ মিস্ত্রির ফেলা বিড়ির টুকরো আগুন ধরালো টাবলু বাবলুর রোদে দেওয়া বাজির স্তূপে; রিনির হাত পুড়লো ইস্ত্রির ছেঁকায়; এমনি উদাহরণ অনেক আছে–আছে রান্নার গ্যাস, ইলেকট্রিকের লাইন থেকে শক, বাজির পাজি অত্যাচার।

ইংরেজী ভাষায় একটা কথা আছে–Safety checks। এগুলো আমরা সবাই জানি তবু আর একবার ঝালিয়ে নেওয়া যাক।

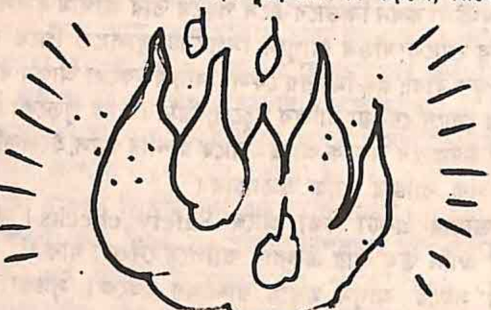
অধিকাংশ সময়ে আগুন ছড়ায় রান্নাঘর থেকে। সুতরাং দেখা প্রয়োজনঃ–

১) দিদি, পিসী কিংবা মা রান্নার সময় কি কাপড় পরেন? সিন্থেটিক কাপড় হলে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া দরকার।
২) রান্নার গ্যাসের চাবিগুলো ঠিকঠাক বন্ধ হয় তো?
৩) উনুনের কাছাকাছি কেরোসিনের টিন বা স্টোভ নেই তো?
৪) মশলাপাতির কৌটোগুলো কি স্টোভের সামনের দেওয়ালের তাকে সাজানো? এটা খুবই বিপদ্জনক–কারণ জ্বলন্ত উনুনের ওপর দিয়ে ঝুঁকে ওপাশ থেকে কিছু নেওয়ার সময় কাপড়ের একটা কোণ আগুন ছুঁয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়!

অবশ্য শুধু রান্নাঘরই নয়, অগ্নিকান্ড ঘটতে পারে অন্যত্রও। লন্ঠন,

হ্যাজাক বা দেওয়ালগিরি এমনভাবে রাখতে হবে যাতে তা কচিকাঁচাদের নাগালের বাইরে থাকে। তেমনি সাবধান হওয়া দরকার ইলেকট্রিক লাইনের ব্যাপারে। বিশেষতঃ নজর দেওয়া দরকার উপযুক্ত আর্থ-লাইন আছে কি না।

আগুনে পোড়া কতটা ক্ষতি করছে তা নির্ভর করে দুটো ব্যাপারের ওপর–এক, পোড়া কতটা গভীরতা অবধি পৌঁছেছে এবং দুই শরীরের কতটা জায়গা পুড়েছে। চামড়ার বিশ-শতাংশ বা তার বেশী পুড়লে রোগীর পক্ষে বিপদ্‌জনক, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটা দশ-শতাংশ মাত্র। কতটা পুড়লো তা বোঝার একটা চট্‌জলদি হিসেব আছে–মাথা ও দুটো হাত ৯ শতাংশ হিসেবে; আর পিঠ, বুক আর পা দুটো মোট শরীরের ১৮ শতাংশ হিসেবে ৬৪ শতাংশ। এই হিসেবমতো গরমজল পড়ে হাঁটু থেকে পায়ের নীচ পর্যন্ত চামড়া পুড়ে ফোস্কা পড়লে, ধরতে হবে ১৮-এর



অর্ধেক অর্থাৎ ৯ শতাংশ আন্দাজ পুড়েছে। যে সব পোড়ায় ফোস্কা ওঠে, বুঝতে হবে সেক্ষেত্রে তাপ, চামড়ার বেশী গভীরে যায় নি। কিন্তু তাপ যদি পুরু চামড়া গোটাটা পুড়িয়ে ফেলে, সেক্ষেত্রে ফোস্কা ওঠে না–পোড়া চামড়ার রং হয় পাঁশুটে, ছাইপানা। দেখা গেছে যে বস্তুটি পোড়াচ্ছে, তার তাপমাত্রা সত্তর ডিগ্রী সেলসিয়াসের বেশী হলে, স্পর্শবিন্দু বরাবর চামড়ার বাইরের অংশ বা এপিডার্মিস ও ভেতরের ডার্মিস অংশকে পুড়িয়ে ফেলতে তা সময় নেয় মাত্র ১০ সেকেন্ড।

নানারকম সাবধানতা সত্ত্বেও আগুনে পুড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে যায়। বোম্বাই-এর এক হাসপাতালের তরফ থেকে আগুনে পোড়ার রোগীদের ওপর এক সমীক্ষা চালানো হয়েছিল–পুড়ে যাওয়ার পর ক্ষতস্থানে কে কী লাগিয়েছেন। শতকরা ৫২ জন ব্যবহার করেছেন বিজ্ঞাপনের দৌলতে

জানা বিভিন্ন মলম, তেল-ঘি-বনস্পতি লাগিয়েছেন শতকরা ২১ জন। অনেকেই কিছু ব্যবহার করেননি; পোড়ার ওপর জল ব্যবহার করেছেন শতকরা মাত্র ১ জন।

অথচ পোড়ার চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ও সব থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসটিই হচ্ছে জল। গায়ে আগুন লাগলে কিছু ভাবার আগেই জল ঢালতে হবে বালতি করে। প্রচলিত বিশ্বাস–পোড়ার ওপর জল লাগলে ফোস্‌কা পড়বেই। অথচ ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল। চামড়ার ওপর খানিকটা অংশ পুড়লে নীচের সজীব কোষগুলো থেকে বেরিয়ে আসে জল–যাতে নীচের অংশে তাপ না পৌঁছতে পারে। ফোস্কা আসলে এক ধরনের প্রতিরোধ ব্যবস্থা। যেহেতু জলের আপেক্ষিক তাপ বেশী, জল তাপ শুষে নেয় অনেকটাই, ফলে তাপ, চামড়ার গভীরে যেতে পারে না। পাশাপাশি আর একটা সুবিধে হল–ভিজে জামাকাপড় আগুন নেভায়। আগে বলা হতো, জামাকাপড়ে আগুন লাগলে কম্বলে জড়িয়ে আগুন নেভাতে হবে। মোটা কম্বল বাইরের বাতাসকে আগুনের শিখা থেকে বিচ্ছিন্ন করবে–ফলে আগুন নিভে যাবে।

গোড়াতে বলা বিজ্ঞাপনের কথায় ফিরি বরং। পুড়ে গেলে মলম ব্যবহার করলে যে বিশেষ কোন উপকার হয় না সেকথা আজ বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করে দিয়েছেন। কাটার ওপর বিশেষ কিছু মলম লাগালে একটু ঠান্ডা ভাব লাগে ঠিকই। এর জন্য মলমে মেশানো থাকে 'থাইমল' বলে একধরনের রাসায়নিক পদার্থ। এর কিন্তু কোন তাপরোধী বা ফোস্কা প্রতিরোধ গুণ নেই। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে পুড়ে যাওয়ার চিকিৎসায় প্রথম কথাই হল 'জল'। জল ঢালতে হবে বারবার অন্তত ১০-১৫ মিনিট ধরে, যতক্ষণ না রোগী একটু সুস্থবোধ করছে। অবশ্য শুধু জল ঢাললেই চলবে না, পাশাপাশি আরো কয়েকটা কথা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। যেমন–তাপে চামড়ার নীচের রক্তবহা নালীগুলো পুড়ে যায়–কমে যায় শরীরে জলের ভাগ। এটা বাইরে থেকে যোগান দেওয়া দরকার। জল বা ফলের রস খাওয়ানো খুব দরকার এ সময়। পুড়ে যাওয়ার পর একদিকে জল ঢালতে হবে, পাশাপাশি দরকার পাখার বাতাস। উদ্দেশ্য একটাই–পোড়া জায়গার তাপমাত্রা কমানো। ক্ষতস্থানে জামাকাপড়ের টুকরো পুড়ে আটকে থাকলে টানাটানি করা নিষেধ। কিন্তু পোড়া যদি বেশী হয়–সেক্ষেত্রে পরিষ্কার কাপড়ে রোগীকে জড়িয়ে অ্যাম্বুলেন্স বা গাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে কাছাকাছি হাসপাতালের বার্ন-ইউনিটে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। বাকি যা করণীয়, তা করবেন তাঁরাই।

চামড়ার জিনিসে যদি দাগ ধরে!

রবিবারের সকাল। সকাল নটা নাগাদ মৌজ করে চায়ের কাপে চুমুক লাগাচ্ছি—হঠাৎ কানে এলো ধুপধাপ করে কিল-চড়ের শব্দ, সঙ্গে বাচ্চার কান্নার আওয়াজ। বুঝলাম, পাশের বাড়ীর চারবছরের টুবাই কোন একটা অপকর্ম করেছে।

অপকর্মটা কি তা পরিষ্কার হলো খানিক পরে। বোন এসে জানালো,—দাদা, টুবাই-এর কান্ড শুনেছো?

—কান্ডটা যে সুবিধের হয়নি, তা ওর আওয়াজেই মালুম হয়েছে। কিন্তু সঠিকভাবে ঘটনাটা বল্ দেখি?

—টুবাই-এর মামা, টুবাই-এর মাকে কদিন আগে একটা ব্যাগ দিয়েছে। বাইরে থেকে আনা – দুধ-সাদা রঙ। সেই ব্যাগের ওপর লিপস্টিক দিয়ে টুবাই মহানন্দে ছবি এঁকে রেখেছে। সুতরাং এর পরে যা হবার তাই হয়েছে।

কথার ফাঁকে দরজায় উঁকি মারেন পাশের বাড়ির বৌদি—অর্থাৎ টুবাই এর মা।

—একটা সমস্যায় পড়ে এলাম।

—কি করে চামড়ার ব্যাগ থেকে লিপস্টিকের দাগ তুলবেন? তাই তো?

বিব্রতভাবে হাসলেন বৌদি।

—এক কাজ করুন বরং। তিনটে জিনিস যোগাড় করতে হবে। এক—গ্লিসারিন কিংবা ইউক্যালিপটাস তেল; দুই—অ্যামোনিয়া আর তিন—কার্বন টেট্রাক্লোরাইড।

গ্লিসারিন ঘরে আছে। কিন্তু অন্য দুটো?—জিজ্ঞাসা করেন বৌদি।

দু—নম্বর আইটেম আমার কাছে আছে—দিয়ে দিচ্ছি। বুলা—স্মেলিং সল্টের শিশিটা বৌদিকে দিয়ে দে তো। এটাও আসলে অ্যামোনিয়া। যারা কেমিক্যাল ল্যাবরেটরীতে কাজ করে, তাদের বললেই শিশিতে করে একটু অ্যামোনিয়া দিয়ে দেবে।

—এক আর দুই তো হলো। কিন্তু তিন নম্বর?

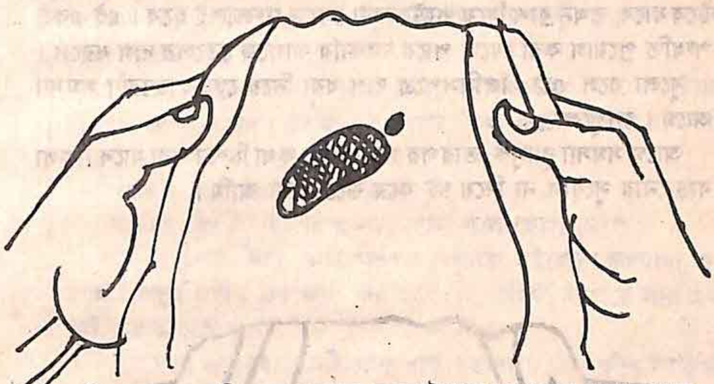
—সেটাও আপনার ঘরেই আছে বোধহয়। দাদা টেপরেকর্ডারের ময়লা

পরিষ্কার করার জন্য একটা 'লিকুইড' ব্যবহার করেন নিশ্চয়ই ? দেখুন– শিশির গায়ে লেখা আছে টেপ-রেকর্ডার হেড-ক্লিনার। ওটাই কার্বন টেট্রাক্লোরাইড।

–জিনিসগুলো তো যোগাড় হলো। তারপর ?

–তুলোতে গ্লিসারিন ভিজিয়ে লিপষ্টিকের দাগের ওপর ঘষতে থাকুন! দেখবেন লাল রং ক্রমে ফিকে হচ্ছে। এবার আর একটা তুলোয় অ্যামোনিয়া ভিজিয়ে দাগের ওপর ঘষে নিন বারকয়েক। সবশেষে অন্য একটা তুলো কার্বন টেট্রাক্লোরাইডে ভিজিয়ে স্পঞ্জের মতো চেপে চেপে ধরুন দাগ বরাবর কয়েকবার। দেখবেন লিপষ্টিকের দাগ ভ্যানিশ হয়ে গেছে।

–চামড়ার দাগ তোলা নিয়ে যখন কথা হচ্ছে, আর একটা সমস্যার কথা



বরং বলি। দেখুন দেখি, সমাধানের কোন উপায় আপনার জানা আছে কিনা।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই বৌদি বললেন–বর্ষাকালে চামড়ার জিনিসপত্রে 'ছাতা' পড়ে বিশ্রী দাগ ধরে। কি করে ঐ দাগ ওঠাই বলুন দেখি ?

–'ছাতা' পড়লে তার দাগ তোলা বেশ কঠিন, তবে 'ভেসলিন' ঘষে দাগ তোলার চেষ্টা করতে পারেন। পাইন তেল দিয়েও সুফল পাওয়া যায়, এমন দাবী করেন কেউ কেউ। তবে পাইন তেল বা ইউক্যালিপটাস তেল সরাসরি ব্যবহার না করে অল্প অল্প গরম জলে মিশিয়ে লাগালে ফল পাবেন চটপট্।

পাশ থেকে চট করে বুলা বলে ওঠে,–কদিন আগে বাস থেকে বিশ্রী তেলের দাগ লেগেছে ব্যাগটাতে। কি করে দাগটা তুলি বল তো?

–চামড়ার ওপর তেল বা গ্রীজের দাগ তুলতে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড ভাল কাজ দেয়। কাপড়ে ভিজিয়ে হালকাভাবে ঘষে দিলেই দাগ উঠে যাবে।

আর বালিশ, তোষক বা সোফা কভারে তেলের ছোপ ধরলে?– জিজ্ঞাসা করেন পাশের বাড়ির বৌদি।

–এখানেও সমস্যার সমাধান করবে কার্বন-টেট্রাক্লোরাইড। তবে সবথেকে ভাল হয় যদি ফ্রেঞ্চ-চক্ বা ট্যালকম পাউডার কার্বন টেট্রাক্লোরাইডে গুলে একটা 'লেই' তৈরী করে সেটা তেলের দাগের ওপর লাগিয়ে দেওয়া যায়। খানিকক্ষণ রাখার পর কার্বন-টেট্রাক্লোরাইড উবে যাবে, তখন ব্রাশ দিয়ে পাউডারটা ঝেড়ে ফেললেই হবে। এই একই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে দরকারি কাগজে তেলের দাগ ধরলে।

বুলো বলে ওঠে,–জিনিসপত্রে দাগ ধরা নিয়ে তো হাজারটা সমস্যা আছে। সেগুলো.....

আগে সমস্যা আসুক, তারপর সমাধানের কথা চিন্তা করা যাবে। কথা বাড়ানোর সুযোগ না দিয়ে চট্ করে উঠে পড়ি আমি।



জামা কাপড়ের দাগ

বিয়ে বাড়িতে যাবার তোড়জোড় চলছে, এমন সময় আওয়াজটা কানে এল!

ছোটমাসীর গলা মনে হচ্ছে?–পাঞ্জাবিটা গলাতে গলাতে বাবলুকে খোঁচা মারে গাবলু : ব্যাপারটা কি?

ছোড়দি ঘরে ঢুকতেই অবশ্য রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে যায়। আলমারিতে তুলে রাখা বেনারসীটা খুলতেই নাকি ছোটমাসীর চোখে পড়েছে দাগগুলো। আর ঐ শাড়িটাই নাকি সেজমাসী পরেছিল আগের দিন। সুতরাং.....

মাঝখান থেকে বাবলু বলে ওঠে,–সেজমামাকে ধরলে সমস্যার সমাধান হতে পারে! কেমিষ্ট্রির লোক, কিছু একটা উপায় বাতলাবে ঠিক।

সেজমামা বললো,–দাগটা কিসের?

–সেটাই তো বোঝা যাচ্ছে না। লাল লাল ছোপ ছোপ!

শাড়িটা হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে রইলো সেজমামা,–মনে হচ্ছে মরচের দাগ। এক কাজ কর বরং। এ শাড়িটা না পরে অন্য একটা শাড়ি পরে চলে যা।

ফোঁস করে ওঠে ছোটমাসী–থাক্ থাক্, তোমাকে আর বুদ্ধি দিতে হবে না সেজদা। দাগ তোলার কোন উপায় জানা থাকলে বল চট্পট্।

–আসলে দাগটা পুরনো তো। তুলতেও তাই ঝামেলা বিস্তর। যেমন ধর, প্রথমে খানিকটা অক্সালিক অ্যাসিড যোগাড় করতে হবে। সে না হয় আমি ম্যানেজ করে আনবো!

–তারপর?

–ধর্ আধ লিটার গরম জলে ঐ অ্যাসিড মিশিয়ে সেই দ্রবণে দাগ ধরা জায়গাটা ভিজিয়ে রাখতে হবে কয়েক ঘন্টা।

–কতটা অ্যাসিডে মেশাবো?

–হাফ-লিটারে চামচ চারেক মেশালেই হবে। পরে দ্রবণ থেকে তুলে ঠান্ডা জলে কাপড়টা ধুয়ে নিতে হবে ভালভাবে।

–কিন্তু যদি রং চটে যায়?

–যেতেই পারে। সেক্ষেত্রে করণীয় হচ্ছে, খাবার সোডার লঘু দ্রবণ বা অ্যামোনিয়া লাগাতে হবে ঐ জায়গায়।

ফাঁক পেয়ে বাবলু জিজ্ঞাসা করে,–আচ্ছা সেজমামা, কাপড়ে চা-কফির দাগ লাগলেও কি ঐ একই ট্রিটমেন্ট ?

–না না! সে দাগ তোলা সোজা। তবে কাজটা করতে হবে তিন ধাপে। সমপরিমাণ রেক্‌টিফায়েড স্পিরিট আর জল মিশিয়ে দাগটার ওপর ঘষতে হবে তুলো দিয়ে। যদি এতে না ওঠে তখন তার ওপর লাগাতে হবে গ্লিসারিন। শেষে তেলতেল ভাবটা কাটানোর জন্য দরকার কার্বন টেট্রাক্লোরাইড।

গাবলু বললো,–আমার স্কুলের সবকটা শার্টের পকেটে পেনের কালির দাগ। ধুলেও যাচ্ছে না। কি করা যায় বলতো সেজমামা ?



–প্রথমে অ্যাসিটোন, পরে স্পিরিট ঘষলে দাগটা চলে যাবে মনে হয়। অবশ্য এটা ডট পেনের কালির কথা বললাম। ফাউন্টেন পেনের কালির দাগ তোলা বিস্তর ঝামেলার।

কিরে তোদের এতক্ষণ দেরি হচ্ছে কেন ? –ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে যান সেজ মামীমাঃ কি রে বাবলু, তোদের মামা কি নিয়ে লেকচার দিচ্ছিলো রে ?

–লেকচার নয় মামী, দরকারী পরামর্শ। কথা হচ্ছিল জামা-কাপড়ের দাগ তোলা নিয়ে।

খানিকক্ষণ মামার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন মামী, –আচ্ছা, যদি জামা-কাপড়ে রক্তের দাগ লাগে ?

–এটা আর কঠিন কাজ কি ? সদ্য লাগা রক্তের দাগ গরম জলে ধুলেই চলে যায়। অবশ্য দাগ যদি পুরোনো হয়ে যায় সেক্ষেত্রে অন্যভাবে ঘষা যেতে পারে।

–তাতেও যদি না হয় ?

–একটা ন্যাকড়া হাইড্রোজেন-পার-অক্সাইড দ্রবণে ভিজিয়ে দাগটির ওপর ঘষতে হবে। তবে রঙিন কাপড় হলে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড না লাগানোই ভালো। কারণ, তাতে কাপড়ের রং ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

বুঝলাম। –সেজমামী মামাকে টাইট দিতে না পেরে একটুক্ষণ ভাবলেন। মুখের মধ্যের পানটাকে নাড়াচাড়া করলেন এদিকওদিক। তারপর বললেন, –আচ্ছা, যদি পানের দাগ লাগে ?

এটা কোনো সমস্যাই নয়। – মুস্কিল আসান সেজমামার মুখে সবজান্তার হাসিঃ দই বা পাতিলেবুর রসে ছোপ লাগা অংশটা আধঘন্টাটাক ভিজিয়ে রাখবে। তারপর আস্তে আস্তে ঘষো, যতক্ষণ না ওঠে !

যতক্ষণ না ওঠে ! এ কী ঝামেলা রে বাবা ! –সেজমামী ব্যাজারঃ আচ্ছা, আমাদের পুঁচকেটা রাত্রে প্যান্টে প্রায়ই 'সি-ই' করে দেয়। সে দাগ তুলি কেমন করে, বলো তো ?

ওর সমাধান তো তোমার হাতের কাছেই। –সেজমামা মুচকি হাসেন ঃ গরম জলে প্যান্টটা ভিজিয়ে দাগের জায়গায় তোমাদের সাদা ভিনিগার ও জলের দ্রবণ ফেলো ও ঘষো। এবার চটপটই উঠে যাবে।

আচ্ছা মামা, –মামীকে পেছনে ফেলে এবার সামনে আসে গাবলুঃ রাস্তায় বেরোলে বেয়াদপ কাক্-পায়রাগুলো যখন তখন জামা প্যান্টের ওপরই অপকর্ম করে দেয়। বাড়ি ফিরে ঘষলেও সাদা জামার একটা অস্পষ্ট দাগ রয়ে যায়। এটা যাবে কেমন করে ?

কুছ পরোয়া নেই। –সেজমামা বললেন ঃ বাড়িতে ফিরে আধ বালতি গরম জল নিবি। তাতে একমুঠো বেকিং সোডা ও এক টেবিল চামচ গুঁড়ো সাবান মেশাবি। জামা বা প্যান্টটা এতে চুবিয়ে অল্প ঘষলেই দেখবি– দাগ ভ্যানিশ !

তোমরা এই দাগী-সমস্যা নিয়েই আলোচনা করো, –সেজমামী এবার অন্যপথে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন ঃ বিয়ে বাড়িতে যেতে হবে না ? রাত ক'টা বাজলো খেয়াল আছে ?

টিউব লাইট সমস্যা

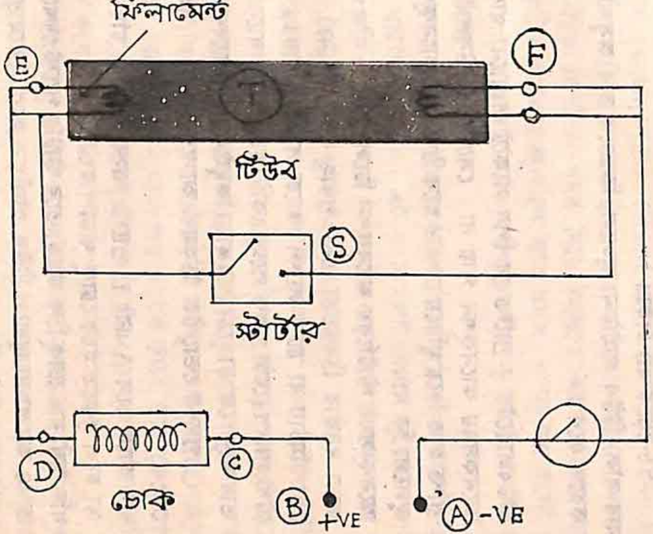
টিউবলাইট নিয়ে টুকটাক সমস্যা প্রায়ই লেগে থাকে। ছোটখাট যান্ত্রিক ত্রুটির ফলে মাঝে মাঝেই আলো জ্বলে না– ইলেকট্রিসিয়ানকে সব সময় হাতের কাছে পাওয়া যায় না। আবার যখন তিনি এলেন, হয়ত বা একটা তার একটু লাগিয়ে দিয়ে দশ-পনেরো টাকা নিয়ে চলে গেলেন! তখন অনেকেরই হয়তো মনে হয়–ইস্, একটু যদি ইলেকট্রিকের কাজ জানা থাকত! অথচ টিউব-লাইট সম্পর্কে একটু প্রাথমিক ধারণা থাকলেই টুকটাক মেরামতির কাজ করে নেওয়া যায়, ইলেকট্রিসিয়ানের সাহায্য ছাড়াই।

গোড়ায় বরং সংক্ষেপে বলে নিই টিউবলাইট কি ভাবে জ্বলে। টিউবের ভেতরের গায়ে থাকে প্রতিপ্রভ বা ফ্লুরোসেন্ট রঙের একটা প্রলেপ। এই প্রলেপ বিভিন্ন রাসায়নিকের হতে পারে। যেমন, – গোলাপী আলোর জন্য ক্যাডমিয়াম বোরেট। সবুজ আলো–জিংক সিলিকেট, ইত্যাদি!

টিউবের ভেতর বেরিয়াম অক্সাইডের প্রলেপযুক্ত দুটো টাংস্টেন তারের কুন্ডলী থাকে–যার কাজ হচ্ছে ইলেকট্রন ছাড়া। টিউবটা বায়ুশূন্য করে কিছুটা আর্গন, নাইট্রোজেন গ্যাস ও কয়েক ফোঁটা পারদ ভরে দেওয়া হয়। বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের অ্যাকটিভেশন ও পারদবাষ্প সৃষ্টি হয়, যা তীব্র আলো তৈরি করে। পারদবাষ্প থেকে তৈরি ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অতি বেগুনীরশ্মি ফ্লুরোসেন্ট প্রলেপের ওপর পড়ে দীর্ঘ-তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মিতে রূপান্তরিত হয়, যা আমাদের চোখে এসে পৌঁছোয়।

টিউবলাইটের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দু-একটা শব্দ চলে আসে, যেমন– চোক, স্টার্টার, ইত্যাদি! এগুলো সম্পর্কে দু-একটা কথা বলে নিই। চোক জিনিসটা প্রকৃতপক্ষে একটি Iron-core Inductance। এর কাজ টিউবলাইটকে সক্রিয় করার জন্য প্রাথমিক হাই-ভোল্টের জোগান দেওয়া। এটা দেখতে একটা ধাতব বাক্সের মতো।

টিউবলাইটের আর একটা অত্যাবশ্যক অংশ নস্যির ডিবের আকারের স্টার্টার। স্টার্টারের কাজ শুধুমাত্র আলোটাকে জ্বালানোর কাজ শুরু


ফিলামেন্ট
E
F
T
টিউব
S
স্টার্টার
D
C
চোক
B
+VE
A
-VE

করানো। একবার আলো জ্বলতে শুরু করলে স্টার্টারের আর কোন কাজ থাকে না।

এবার এইসব অংশগুলো দামের একটা মোটামুটি আন্দাজ দিচ্ছি–

টিউব–২৮ থেকে ৩২ টাকা

চোক–৩০ থেকে ৪০ টাকা

স্টার্টার–২ থেকে ৪ টাকা

ফ্রেম (যার ওপর টিউবলাইট ফিটিংস বসবে)

–১৬ থেকে ২০ টাকা।

এবার বলি, টিউব লাইট না জ্বললে, কিভাবে তার অসুখটা ধরবার চেষ্টা করতে হবে :–

1. টিউবলাইটের দু-প্রান্তে যে পিন্ সকেটে লাগানো থাকে, সেটা অনেকসময় কানেক্শন পায় না। সেক্ষেত্রে টিউবলাইটটির দু-প্রান্ত হাত দিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে হবে ঠিকমতো কানেক্শন পেয়ে জ্বললো কি না।
2. অনেক সময় স্টার্টারের কানেক্শন ঢিলে থাকে।
3. জানা দরকার ঠিকমতো তড়িৎপ্রবাহ হচ্ছে কি না। এর জন্য ভোল্টমিটার বা 'টেস্ট-ল্যাম্প' কাজে লাগানো যায়।

3a. টেস্ট ল্যাম্প (যেটা প্রকৃত পক্ষে একটি হোল্ডারে লাগানো বালব ও তার সঙ্গে জোড়া দুটো তার ছাড়া কিছুই নয়) দিয়ে দেখতে হবে A ও C প্রান্তে ভোল্টেজ ঠিকমত আসছে কি না। (সুইচ থেকে চোকে)

3b. যদি আসে তবে A এবং D প্রান্তে আসছে কি না। যদি না আসে, তা হলে বুঝতে হবে চোক্ খারাপ হয়েছে।

3c. যদি দেখা যায় চোক্ ঠিক আছে, তবে স্টার্টার পাল্টে দেখতে হবে।

3d. তা-ও আলো না জ্বললে টিউব পাল্টাতে হবে। যেহেতু টিউবের দাম আছে, টিউবটি ফেলে দেওয়ার আগে অন্য একটি ফিটিং-এ লাগিয়ে দেখা উচিত সত্যিই টিউবটি খারাপ কি না।

3e. এতেও যদি না জ্বলে তবে বুঝতে হবে কোথাও ঠিক মতো কানেক্শন পাচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে 'ওহম-মিটারের সাহায্যে দেখতে হবে সার্কিটে সর্বত্র কারেণ্ট যাচ্ছে কিনা। তবে এ ব্যাপারটা নিজে হাতে কলমে আগে না করলে অবশ্য একজন অভিজ্ঞ ইলেট্রিসিয়ানের শরণাপন্ন হতেই হবে।

বিদ্যুৎ থেকে বিভ্রাট

অফিসে এসে বিরক্তমুখে নিজের সীটে বসে পড়লো যতীন।

কিছু একটা গন্ডগোল আঁচ করে রমেনদা শুধোল যতীনকে, -কিরে, কোথায় গন্ডগোল পাকিয়ে এলি ? রাস্তায় না বাড়িতে ?

আর বোলো না! – টেবিলে রাখা জলের গেলাসের দিকে হাত বাড়ালো যতীন : বাবাকে নিয়ে যতো ঝামেলা। অফিসে আসবার আগে ইলেকট্রিক মিস্ত্রীকে খবর দিয়ে আসতে হলো, আজ যেন বাড়ির ইলেকট্রিক লাইন 'চেক্-আপ' করে আসে। বাবার কথা হলো, প্রতি বছর বর্ষার মুখে এ কাজটা নাকি অবশ্য করণীয়। তা না হলে বাড়িশুদ্ধু লোক শক্ খেয়ে মারা পড়বে।

পাশের টেবিল থেকে মনোজদা বলে ওঠেন, –কথাটা কিন্তু তোমার বাবা খারাপ বলেননি। এই বর্ষাকালেই দেখবে পুরোনো বাড়িতে যত বিদ্যুৎজনিত দুর্ঘটনা ঘটে। ভেজা দেওয়াল থেকে শক্, তারে জল পড়ে লাইন ফিউজ–এসব খুবই সাধারণ ঘটনা।

রমেনদা বললেন, –কয়েক বছর আগে দেখা কলেজ স্ট্রীটের সেই দুর্ঘটনার কথা কি কোনদিনও ভুলতে পারবো ? ট্রামের ওভারহেড লাইন ছিঁড়ে পড়েছে বাসের মাথায়, আর রাস্তায় এক হাঁটু জল। বাস থেকে নামতে গিয়ে জলে পা ছোঁয়াতেই–বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলেন পরপর ক'জন মানুষ। আরো ক'জন মারা পড়তো কে জানে, নেহাত আশপাশ থেকে ছেলেরা ঠেলাঠেলি করে দুটো ঠ্যালাগাড়ি এনে বাসের গায়ে লাগিয়ে সিঁড়ি তৈরি করেছিল বলেই বাকিরা বেঁচে যায় সে যাত্রা।

অপরেশবাবু কথার ফাঁকে কখন মনোজদার টেবিলের পাশে এসে বসেছেন খেয়ালই করেনি কেউ। অপরেশবাবুর আবার টুকটাক ইলেকট্রিকের কাজকর্মের ঝোঁক আছে, এ খবরটা মোটামুটি রাখে সবাই।

যতীনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই অপরেশবাবু বলে ওঠেন, –সেদিন ঠ্যালার কথাটা যার মাথায় এসেছিল, কৃতিত্বের সিংহভাগটা প্রাপ্য তারই। কোন গোলমেলে পরিস্থিতিতে পড়লে বুদ্ধি কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যায়, ফলে দুর্ঘটনাও ঘটে যায় সেই সূত্র ধরেই।

যেরকম ? –জিজ্ঞাসুভাবে অপরেশবাবুর মুখের দিকে তাকান রমেনদা।

–অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন ধরুন, এরকম খবর মাঝেমাঝেই চোখে পড়ে, স্নান করে কাপড় মেলতে গিয়ে, বা ঘরের সুইচবোর্ড হাত দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছেন কোন মহিলা। এ সব ক্ষেত্রে দায়ী বাড়ির ইলেকট্রিক লাইনের ত্রুটিপূর্ণ 'আর্থিং' –যার থেকে সুইচ বোর্ড বা নিচেকার ভিজে দেওয়ালও 'শক' দিতে পারে। কিংবা ধরুন, আমাদের একটা সাধারণ অভ্যেস 'আর্থের তার' জলের পাইপে পেঁচিয়ে দেওয়া। আবার জলের পাইপকে খুঁটি করে ভেজা কাপড় শুকোবার জন্য লোহার তার টাঙানোর অভ্যেসও অনেক বাড়িতেই আছে। ধরুন 'আর্থ-লাইনে' গন্ডগোলের ফলে লোহার জলের পাইপ এবং কাপড়ের তার দুই-ই বিদ্যুতাহত হয়ে রয়েছে। এক্ষেত্রে তারে ভেজা কাপড় মেলতে গেলে 'শক্ লাগার' তীব্রতা বাড়বে বহুগুণ। ফলে যে ২২০



ভোল্ট 'সামান্য শক' দিয়েই মানুষকে তার উপস্থিতি বুঝিয়ে দিতো, সেই ২২০ ভোল্টই ভিজে কাপড় আর ভিজে হাতের সংস্পর্শে হয়ে উঠবে প্রাণঘাতী !

তাহলে বিদ্যুৎ এবং জল কখনই কাছাকাছি নয়। –বলে ওঠে যতীন।

–সে তো নিশ্চয়ই। কেউ যদি অভ্যেস করে নেন, ভিজে কাপড় মেলবো রবারের চটি বা কাঠের খড়ম পড়ে, তাহলে কিন্তু বিপদের আশংকা কমে অনেকখানিই। তেমনি যদি আমরা চোখের সামনে দেখি, হঠাৎ শক্ খেয়ে কেউ অজ্ঞান হয়ে গেছেন এবং যে জিনিসটা থেকে 'বৈদ্যুতিক শকের' উৎপত্তি সেটি শরীরের সংগে লেগে আছে, তখন হতবুদ্ধি হয়ে আমরা অধিকাংশ মানুষই বিপদ ঘটিয়ে ফেলি।

বিদ্যুতাবিষ্ট মানুষকে হাত দিয়ে টেনে সরাতে গেলে বিপদ অনিবার্য, কারণ সেই অবস্থায় তাকে ধরা, আর বিদ্যুৎ স্পর্শ করা একই ব্যাপার। অথচ একটুকরো লম্বা কাঠ বা লাঠি, নিদেনপক্ষে কাঠের স্কেল কি বাঁশের ঝুলঝাড়া দিয়ে যদি মানুষটিকে বিচ্ছিন্ন করা যায়, তাহলে কিন্তু বিপদের সম্ভাবনা নেই।

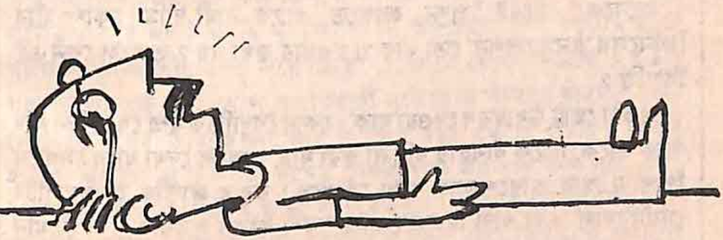
কিন্তু ধরুন এমনও তো হতে পারে, কোনোটাই হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে না। তখন? –প্রশ্ন করেন মনোজদা।

–উপস্থিত বুদ্ধি বলে, বাড়ির মেন সুইচ 'অফ' করে ফিউজ খুলে দেওয়াটা। এজন্য দেখবেন আজকাল অনেক বাড়িতেই প্রতি ঘরের জন্য একটা করে ফিউজ এবং একটা সাধারণ 'মেন সুইচ' হাতের নাগালের মধ্যেই বোর্ডের ওপর বসিয়ে নেন অনেকে। ফলে তিনতলা বাড়ির তিনতলাতে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে, মেন 'অফ' করতে আর একতলায় ছুটতে হয় না।

যতীন বললো, –অনেকগুলো দরকারি কথা বললেন অপরেশদা। একটু বসুন, চা-আনতে দিয়েছি।

ঘাড় নাড়লেন অপরেশবাবু, –বিস্তর ফাইল জমেছে টেবিলে। তোমাদের এখানে চা চলুক, আমি আমার টেবিলে ফিরি। তবে হ্যাঁ, জোরালো শকের ধাক্কাটা পড়ে হার্ট, শ্বাসপ্রশ্বাস এবং নার্ভের ওপর। সুতরাং অজ্ঞান হয়ে গেলে ডাক্তার ডাকতে হবে। আর কয়েক মুহূর্তের জন্য অজ্ঞান হয়ে তারপর জ্ঞান ফিরলে, উচিত তাকে একটু গরম দুধ বা নিদেনপক্ষে জল খাওয়ানো। কোথাও পুড়লে তার ওপর হাল্কা জীবাণুনাশক ব্যান্ডেজ দেওয়া এবং খানিকক্ষণ চুপচাপ শুইয়ে রাখা।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে এরপর চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন অপরেশবাবু।



বিদ্যুৎ—বুদ্ধিমানেরা যেসব ভুল করেন

শীতের সকালে ইমারশান হীটারে স্নানের জল গরম করতে গিয়ে শক্ খেলেন শীতলবাবু। আগের দিন অফিস পাড়ার ফুটপাতে ঢেলে বিক্রী করা জল গরম করা হীটার পাঁচ টাকায় বাগাতে পেরে শীতলবাবু খোশমেজাজেই ছিলেন। কিন্তু প্রথম দিনই এমন বিপত্তি ঘটবে কে জানতো !

সন্ধ্যেবেলা শীতলবাবুকে দেখতে এসে গজেনবাবু বললেন,— একেই বলে সস্তার তিন অবস্থা। বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জামের ব্যাপারে 'কটেজ ইন্ডাস্ট্রি'জের ওপর ভরসা না রাখলেই কি নয় ? ঘরের কোণে পড়ে থাকা ইমারশান হীটারটা তুলে ধরে চোখ কপালে তোলে গজেনবাবু বলেন,— আরে সর্বনাশ, এতেতো দেখছি ইনসুলেশনের কোন বালাই নেই। একটু দেখে কিনবে তো ?

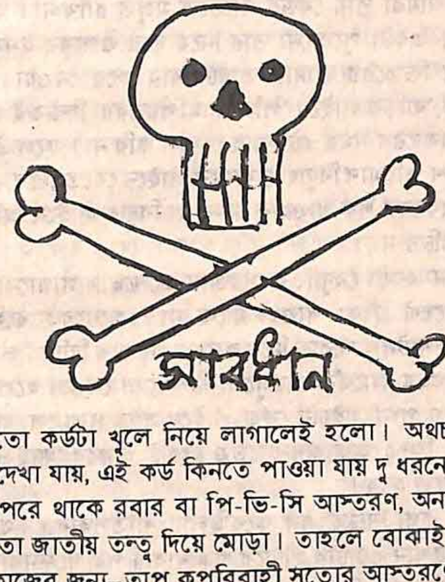
অবশ্য বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম নামী কোম্পানীর হলেই যে বিপদ ঘটবে না, এমন কথাও জোর গলাতে বলা যায় না মোটেই। নিজেদের টুকটাক গাফিলতিই অনেক সময় ডেকে আনে সাংঘাতিক বিপদ। দু পিন প্লাগ পাল্টে থ্রি পিন করাটা এমন কিছু ব্যাপার নয়, অথচ এ নিয়ে আমরা ভাবি না মোটেই। থ্রি-পিনের জায়গায় টু-পিন অর্থাৎ কোন বৈদ্যুতিক সরঞ্জামে কারেন্ট-লিক করলে তাকে আর্থ করার কোন সুযোগই থাকছে না। সুতরাং ইলেকট্রিক হীটারের কয়েলের লিকেজের ফলে তড়িতাহত হল ওপরে চাপান কড়াই। তাড়াহুড়োর সময় ঐ কড়াইতে আলু ভাজতে গিয়ে অবধারিতভাবে শক্ খেলেন পিসীমা।

অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগতে পারে—নামী-দামি কোম্পানীর জিনিসের 'ইনস্যুলেশন' তো খারাপ হওয়ার কথা নয় ? তাহলে কেন এই বিপত্তি ?

একটা ছোট্ট উদাহরণ দেওয়া যাক। কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্র বেশি দিন যদি পড়ে থাকে, তাকে ব্যবহার যদি না করা যায়, তাহলে দেখা যাবে সেখানে পিঁপড়ে আর আরশোলায় বাসা বেঁধেছে। রবার জাতীয় 'ইনস্যুলেটিং মেটেরিয়াল' এরা খাদ্য হিসেবে বেশ পছন্দ করে। সুতরাং ....। তেমনি বাড়ির বৈদ্যুতিক ওয়ারিং-র বড় শত্রু উইপোকা। যেখানে উইপোকার

উপদ্রব বেশী, সেখানে শৌখিনভাবে কনসিলড্ ওয়ারিং অর্থাৎ দেওয়ালের ভেতরে লুকোনো তার টানার ব্যবস্থা নেহাতই বোকামি, কারণ লুকোনো ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে গোটা বাড়ির বৈদ্যুতিক লাইনের ইনস্যুলেশন খেয়ে ফেলে উইপোকারাই সাংঘাতিক বিপদ ঘটিয়ে দিতে পারে। তাই বলছিলাম, কোন জিনিস অনেক দিন ব্যবহার না করলে একবার দেখে নেওয়া ভাল নয় কি, ভেতরের ওয়্যারিং-র ইনস্যুলেশন কি অবস্থায় আছে।

ইনস্যুলেশনের প্রসঙ্গে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসে পড়ে ফ্লেক্সিবল কর্ডের কথা। অনেক বাড়িতেই দেখা যায় ফ্লেক্সিবল কর্ড একটাই, তাই দিয়েই যাবতীয় কাজ চালানো হচ্ছে, হীটার, ইস্ত্রিরী, মিক্সার–সব।



দরকারমতো কর্ডটা খুলে নিয়ে লাগালেই হলো। অথচ একটু খেয়াল করলেই দেখা যায়, এই কর্ড কিনতে পাওয়া যায় দু ধরনের–এক ধরনের কর্ডের ওপরে থাকে রবার বা পি-ভি-সি আস্তরণ, অন্য ধরনের রবার থাকে সুতো জাতীয় তন্তু দিয়ে মোড়া। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে এ কর্ড দু ধরনের কাজের জন্য– তাপ কুপরিবাহী সূতোর আস্তরণে বানানো যেটি সেটি ভেতরের তারকে সরাসরি তাপের হাত থেকে বাঁচায়। অর্থাৎ হীটার, আয়রন বা টোস্টার–যাদের কাজই হচ্ছে সরাসরি তাপ সৃষ্টি করা, তাদের পক্ষে এক ধরনের কর্ডই সুবিধেজনক। আবার যে সব বৈদ্যুতিক সরঞ্জামে জলের ব্যবহার আছে যেমন ইমারসান ওয়াটার হীটার, ওয়াশিং

মেসিন ইত্যাদি, সেখানে আবার কটন ইনস্যুলেটেড কর্ড ব্যবহারই বিপদ ডেকে আনতে পারে, কারণ সূতো বা তুলো জলে ভিজে জলীয় বাষ্প ধরে রাখতে পারে অনেকক্ষণ; আর নিচের রবার ইনস্যুলেশনে যদি কোন ফাটল থাকে, সেক্ষেত্রে পুরো তারটাই হয়ে পড়বে বিদ্যুৎ আহিত।

অনেকে কর্ডের স্থায়িত্ব এবং সৌন্দর্য বাড়াতে কর্ডের ওপর রঙ লাগান। এটিও ঠিক নয়, কারণ রঙের সঙ্গে রাবার বা পলি-ভিনাইল-ক্লোরাইডের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে ইনস্যুলেশন গলে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক ঘটনা।

'কিট-ক্যাট' বা 'ফিউজ' বাড়ির বৈদ্যুতিক লাইনের নিরাপত্তা রক্ষী। অথচ নিজের ভুলে এই ফিউজই ডেকে আনতে পারে মারাত্মক বিপদের সম্ভাবনা। ফিউজের বাড়তি তারের প্রয়োজন হতে পারে যে কোন মুহূর্তেই, অথচ আমরা প্রায় কেউই বাড়িতে মজুত রাখি না। আমাদের সাধারণ অভ্যাস–একটা পুরোনো তার নিয়ে তার ওপরের ইনস্যুলেশন চেঁচে বাদ দিয়ে ভিতরের তামার তারটা বার করে নেওয়া। আমরা প্রত্যেকেই জানি, বাড়ির লাইনে 'পাঁচ অ্যামপিয়ারের' ফিউজই লাগানো উচিত, অথচ দরকারের সময় এটা আর খেয়াল করি না। ফলে ঐ তামার তার অনেক বেশি পরিমাণ বিদ্যুৎ-প্রবাহকে লাইনে যেতে দেবে, এবং এর থেকে খুব বড় রকমের শক খাওয়ার ঘটনা বা বিদ্যুৎ-লাইনে অগ্নিকান্ড ঘটে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

বাড়িতে নতুন একটা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এসেছে? লাগানোর মতো একটা প্লাগ পয়েন্ট ফাঁকা পাওয়া যাচ্ছে না? অনেকেই বলেন, কুছ্ পরোয়া নেই, এক্সটেনশন বোর্ড দিয়ে কানেকশন্ করে দিচ্ছি। ভাল কথা, ফেজ, নিউট্রাল আর আর্থের তারগুলো ঠিকমতো নেওয়া হলো তো? দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, সুইচটা ফেজ্-লাইনে সুইচ লাগালে, যন্ত্র অফ-অন হবে ঠিকই, কিন্তু অফ অবস্থাতেও যন্ত্রটি থাকবে 'লাইভ' অর্থাৎ ছুঁইলেই শক্ খেতে হবে।

শীতলবাবুরা কথা নিয়েই শুরু করেছিলাম, শীতলবাবুর কথা দিয়েই শেষ করি। ইমারশান ওয়াটার হীটারে শক্ খাবার পর গজেনবাবুর কথা অক্ষরে অক্ষরে মানছেন তিনি। ফ্রিজের সামনে রবার ম্যাট পেতেছেন, দুটো নতুন ফ্লেক্সিবল কর্ড কিনেছেন এবং স্নানের জায়গায় একটা ছোট কাঠের পিঁড়ি বসিয়ে তার ওপর বালতি রাখছেন। ইমারশান হীটার ব্যবহার করছেন, তবে সুইচ অন করছেন জলে হীটার ডোবানোর পরে, এবং সুইচ অফ না করে ভুলেও তিনি আর বালতি ছোঁন না।

রান্না ঘরের টুকিটাকি–১

পিকনিকে ছোটখাট বিভ্রাট লেগেই থাকে। কদিন আগে রুনু বাবুদের পিকনিকে যেমনটা হলো। পৌঁছানোর পরই রব উঠলো, –চা চাই।

পিকনিকে চা নিশ্চয়ই দরকার। গুঁড়ো দুধ, চা-পাতা, চিনি সবই এসেছে, অথচ নেই শুধু আসলটাই। অর্থাৎ জল গরম করার পাত্র। অন্য পাত্রও নেই, কারণ সব খাবারই এসেছে বাক্সে বা প্যাকেটে। জলের জন্য কাগজের কাপ।

শুকনো মুখে পিঙ্কিদি খবরটা জানাতে, সবাই একেবারে হই হই করে উঠল, –সে কি কথা? কেটলিই আনা হয়নি? তাহলে উপায়?

পিকনিকে মনোমালিন্যের একটা সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে এমন একটা সম্ভাবনা আঁচ করে রুনুদি বলল, –উপায় একটা আছে। কাগজের ঠোঙায় জল গরম করে নিলেই তো হয়!

কাগজের ঠোঙায় জল গরম?–এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে দেখে রুনুদি নিজেই উদ্যোগ করে আগুন জ্বালালো এবং তার ওপর জল গরম করলো ঐ সিদ্ধ ডিম আনা বাদামী কাগজের ঠোঙাতেই।

ঘটনাটা আপাতভাবে আশ্চর্য মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক! স্টোভের ঢিমে আঁচে কাগজের বাক্স বা ঠোঙা বসালে তা কি পুড়ে যাবে না? পরীক্ষাটা নিজের হাতে করলেই সন্দেহ নিরসন হবে। তবে দেখতে হবে আগুনটা যেন ঢিমে থাকে। একটু তেলতেলে কাগজের তৈরি ঠোঙা বা বাক্স এই কাজের পক্ষে সব থেকে উপযুক্ত।

বিজ্ঞানের দৃষ্টি নিয়ে ঘটনাটা বিচার করলে কিন্তু কাগজের ঠোঙায় জল গরমের ব্যাখা সহজেই সম্ভব! ঠোঙার মধ্যে জল দিয়ে ঠোঙাটি তাপের উৎস উপর বসান হল। ঠোঙার মুখটি খোলা। ফলে যতক্ষণই তাপ পাক না কেন, জলের তাপ মাত্রা ১00 ডিগ্রী সেলসিয়াসের বেশি হবে না–অর্থাৎ স্ফুটনাঙ্ক পর্যন্ত। জলের একটা বিশেষ গুণ হচ্ছে যে বিশাল পরিমাণ তাপধারণ ক্ষমতা। ফলে আগুন থেকে যে তাপ কাগজের ঠোঙায় পরিবাহিত হচ্ছে তা তাৎক্ষণিকভাবে টেনে নিচ্ছে জল; কাগজের তাপমাত্রা কখনই ১00 ডিগ্রী ছাড়াবে না। আর কাগজ

পোড়াতে হলে কিন্তু তাপমাত্রা অবশ্যই ১০০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের বেশি হওয়া দরকার। পাশাপাশি একটা কথা মনে রাখা দরকার–কাগজের ঠোঙাতে জল গরম করতে হলে কাগজ সরাসরি যাতে আগুনের সংস্পর্শে না আসে সেটা খেয়াল করা উচিত সবসময়।

জলের এই তাপধারণ ক্ষমতাকে অন্য একটা প্রতিদিনের প্রয়োজনেও লাগানো যায়। শরীরে কোন জায়গা হঠাৎ পুড়ে গেলে চট্‌পট্ ঠান্ডা জল লাগালে ফোস্কা পড়ে না। এর ব্যাখ্যাটাও সহজ–তাপ চামড়ার গভীরে যাবার আগেই জল তার তাপধারণ ক্ষমতার দরুন, বাড়তি তাপকে টেনে নেয়। ফলে ফোস্কা পড়ার সম্ভাবনাও কমে অনেকটাই।

রান্নাঘরের টুকিটাকি–২

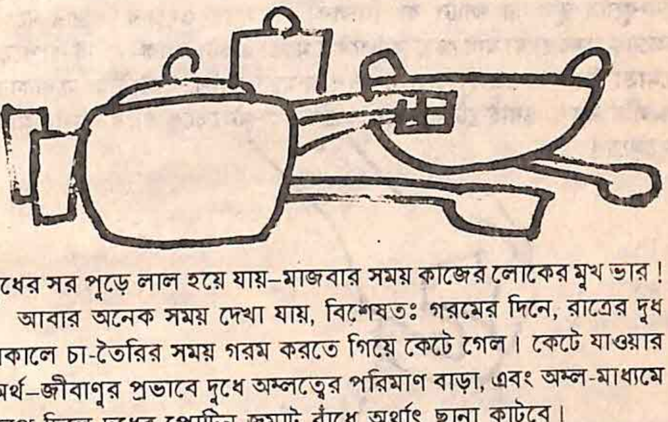
এই যাঃ! চা তৈরীর জন্য গ্লাসে গরমজল ঢালতেই কাঁচের গ্লাস ফেটে গেল চড়াৎ করে! ঝুমার মুখ দেখে বোঝা গেল বেশ খানিকটা অপ্রস্তুত হয়েছে। পাশ থেকে ফোড়ন কাটল ছোট্‌কা, –তোর তৈরি চা যে কি রকম হবে, তা তো বেশ মালুম হচ্ছে। একটা গ্লাস ফাটলো! এবার দেখ গে উনুনে দুধ উথলে পড়লো কি না!

যারা নিয়মিত রান্নাঘরে যাতায়াত করতে অভ্যস্ত নয়, শখ করে মাঝে মধ্যে যায়, তারা রান্নাঘরের ঢুকলে এমনি নানা টুকটাক বিপত্তি ঘটা খুবই স্বাভাবিক। অথচ যাঁরা নিয়মিত রান্না করেন, তাঁদের কাজকর্মে এমন অনেক ছোটখাট ব্যাপার থাকে যা আপাতভাবে তুচ্ছ মনে হলেও তা মোটেই তুচ্ছ না! চা তৈরির ব্যাপারটাই বরং ধরা যাক।

কাঁচের গ্লাস বা পাত্রে গরম জল বা গরম দুধ ঢালতেই হয়। মোটা পাত্রের দেওয়ালের ভেতর গা আর বাইরের গায়ে তাপমাত্রার ফারাক হবেই, গ্লাসে গরম কিছু ঢাললে। কারণ কাঁচ তাপের কুপরিবাহী। কাঁচের দেওয়ালের দু-পাশে অসম প্রসারণ–মাঝ খান থেকে গ্লাস ফাটবে চড়াৎ করে। অথচ গরম জল ঢালবার আগে যদি গ্লাসে একটা সুপরিবাহী, যেমন একটা চামচ রাখা যেত, সেক্ষেত্রে চামচটা বাড়তি তাপ টেনে নিত, গ্লাসও ফাটতো না আর।

ভাল চা পাতার দাম এখন বিস্তর। আবার চায়ের স্বাদ গন্ধ পেতে হলে পরিমাণে খানিকটা না হলে চলে না। এই সমস্যা এড়াতে হলে চা-

পাতা ভিজানোর সময় কাপে বা পটে এক চিমটে নুন ফেললেই হয়। লবণাক্ত মাধ্যমে চা থেকে লিকার তৈরি হয় বেশি। ফলে চা পাতার পরিমাণ লাগে কম। আবার কেউ কেউ কেটলিতে গরম জল ফোটানোর সময় তাতে একটু খাবার সোডা ফেলে দেন। এক্ষেত্রেও কম চা-পাতাতে বেশি লিকার হবে। অনেক সময় দেখা যায় অনভ্যস্ত হাতে কেউ চা পাতা ভিজিয়ে উনুনে দুধ বসালেন। গ্লাস, চিনি যোগাড় করতে গিয়ে দুধের কথা বিস্মরণ–কড়া আঁচে দুধ উথলে বিশ্রী কান্ড ! অথচ দুধ গরম করতে বসিয়ে আঁচটা যদি কম রাখা যায়, আর ডেকচিতে একটা হাতা দেওয়া থাকে, সেক্ষেত্রে দুধ উথলাবে না মোটেই। এক্ষেত্রে বাড়তি লাভ হচ্ছে দুটো–দুধ ফুটতে শুরু করলে আঁচ কমিয়ে রাখলে দুধ গরমের সময়ের তারতম্য হবে না, অথচ গ্যাসের সাশ্রয় হবে। এছাড়া, কড়া আঁচে দুধ বসালে সরাসরি তাপের প্রভাবে পাত্রের ভেতরের গায়ে লেগে থাকা



দুধের সর পুড়ে লাল হয়ে যায়–মাজবার সময় কাজের লোকের মুখ ভার !

আবার অনেক সময় দেখা যায়, বিশেষতঃ গরমের দিনে, রাত্রের দুধ সকালে চা-তৈরির সময় গরম করতে গিয়ে কেটে গেল। কেটে যাওয়ার অর্থ–জীবাণুর প্রভাবে দুধে অম্লত্বের পরিমাণ বাড়া, এবং অম্ল-মাধ্যমে তাপ দিলে দুধের প্রোটিন জমাট বাঁধে অর্থাৎ ছানা কাটবে।

এটা প্রতিকারের উপায়–যদি মনে হয় জ্বাল দিলে কেটে যাবে, সেক্ষেত্রে সামান্য খাবার সোডা দিয়ে দুধটা গরম করতে হবে। যাঁদের বাড়িতে রেফ্রিজারেটার নেই, তাঁরা গরমের দিনে দুধের পাত্রটা যদি সারা দিন একটা বড় পাত্রে জল রেখে সেই জলে ভাসিয়ে বা বসিয়ে রাখেন, তাহলে তাপের প্রভাব অনেকটাই সামাল দেবে বাইরের পাতের জল (যেহেতু জলের তাপ ধারণ ক্ষমতা খুব বেশি) দুধের উপর তাপের ক্ষতিকর প্রভাব অনেকটাই কমবে।

অনেক বাড়িতে কাঁচের গেলাস একটার ওপর একটা থাক করে রাখার রেওয়াজ। অনেকসময় দেখা যায় তুলতে গিয়ে দুটো গেলাস একসাথে উঠে আসছে। এমন জম্পেশভাবে আটকেছে যে খোলে কার সাধ্য! টানাটানি করে লাভ নেই, বরং বাইরের গেলাসের গায়ে গরম জল আর ভেতরের গেলাসের ঠান্ডা জল ঢাললে গেলাস দুটো খুলে যাবে চট্ করে! গরম জলের প্রভাবে বাইরের কাঁচ প্রসারিত এবং ঠান্ডা জলে ভেতরের কাঁচ সংকুচিত হবে–ফলে দুটো গেলাসের মধ্যে ফাঁক বাড়বে, একটা অপরটার মধ্যে থেকে বেরিয়েও আসবে সহজে।

বাড়িতে কেউ এলে এক কাপ চায়ের সঙ্গে দুটো বিস্কুট দেওয়ার রেওয়াজ সব ঘরেই আছে। অথচ এই বিস্কুটকে মুচমুচে রাখাটাই একটা সমস্যা। কৌটোর মধ্যে রাখা সত্ত্বেও অনেক সময়ই বিস্কুট যায় নরম হয়ে। এই সমস্যা এড়াতে বিস্কুটের টিনে কয়েক টুকরো ব্লটিং কাগজ রাখা যেতে পারে। 'সিলিকা জেল' রাখতে পারলে আরো ভাল। যেহেতু বিস্কুটের তুলনায় ব্লটিং বা 'সিলিকা জেলের' (ওষুধের শিশির মধ্যে অনেক সময় দেখা যায় ছোট্ট বালিশের মতো একটা প্যাক–ওটাই কাপড়ে মোড়া সিলিকা-জেল) জল শোষণ ক্ষমতা বেশি, কৌটোর মধ্যেকার জলীয় বাষ্প ওরাই টেনে নেবে আগে, বিস্কুট থেকে যাবে তাজা আর মুচমুচে!



জলের কলে 'লিক'

সকালে ফার্স্ট ক্লাস দশটায়। অ্যাবসেন্ট হবে না বলেই স্নান করতে আগেভাগে বাথরুমে ঢুকেছিল বাবলু। কিন্তু জলের কলটা যে এমন বিপত্তি ঘটাবে তা কে জানতো! কল খুলে দিব্যি সাবান মেখে স্নান করার পর প্যাঁচ ঘুরিয়ে কল বন্ধ করতে গিয়ে বাবলু দেখে জল বন্ধ হচ্ছে না আর। কদিন থেকেই কলটা গড়বড় করছিল, কিন্তু এদিনই এমনভাবে বিগড়োবে তা বাবলু ভাবতে পারেনি। আন্ বালতি, আন্ ডেকচি, প্রেশার কুকার, ঘটি, বাটি–হাউসিং কোয়াপারটিভে জল বড়ই দামী জিনিস। শেষে মিস্ত্রী ডেকে নগদ দশ টাকা খরচ করে কল সারিয়ে বাবলুর চোখ যখন ঘড়ির দিকে গেলো, দেখলো ইতিমধ্যে সাড়ে দশটা বেজে বসে আছে!

সব বাড়িতেই জলের কল থাকে, অথচ কল যে কিভাবে কাজ করে, তা নিয়ে বিশেষ কেউই মাথা ঘামান না। বাড়িতে যদি পুরোনো ভাঙা কল থাকে–পেতল বা প্লাস্টিক যাই হোক না কেন, সেটাকে একটু নেড়েচেড়ে দেখলে ক্ষতি নেই, বরং আখেরে লাভই আছে।

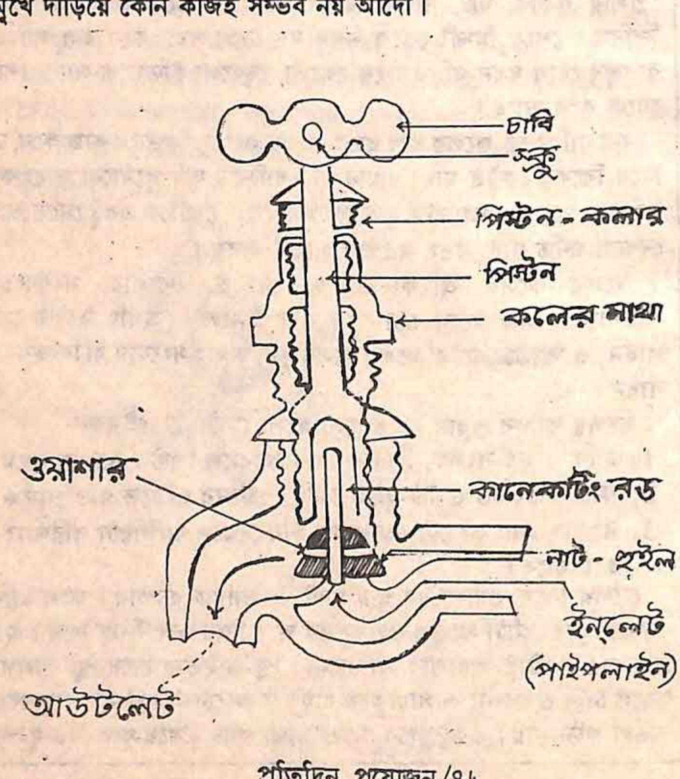
জলের কলের অধিকাংশই গন্ডগোলই 'ওয়াশার' সংক্রান্ত। ওয়াশারের কাজ হলো ওঠা-নামা করা 'ইনলেট' (অর্থাৎ জলের মেন লাইন) ও 'আউটলেটের' মধ্যে (কলের মুখ) অর্থাৎ সংযোগ বা বিচ্ছিন্নতা সাধন।

জলের কলের প্রধান অংশগুলো হলো মোটামুটি এইরকম–

1) চাবি ও তৎ-সংলগ্ন পিষ্টন; চাবি ঘোরালে পিষ্টন ওঠে বা নামে
2) কানেকটিং রড ও নাট-হুইল, যেটি পিষ্টনের গতিতে গতি পায় ও
3) নাটের ওপর বসানো ওয়াশার। ছবি দেখলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

জলের চাপে ওয়াশারের ক্ষয় খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। ফলে চাবি নামিয়ে পুরো আঁটা সত্ত্বেও ওয়াশারের পাশ দিয়ে জল 'লিক্' করে। এর প্রতিকার একটাই–ওয়াশার পাল্টানো। স্ক্রু-ডাইভার দিয়ে স্ক্রু-আলগা করলে চাবি ও পিষ্টন আলাদা হয়ে যায়। তখন টেনে পিষ্টনকে বার করে নেওয়া কঠিন নয়। একইভাবে কলের মাথা প্যাঁচ ঘুরিয়ে খুলে নাট-হুইল

এবং কানেকটিং রড বার করে নেওয়া সম্ভব। দেখে নেওয়া দরকার, হুইলের ওপর ওয়াশারটি কিভাবে বসান আছে। নাট খুলে ওয়াশার পাল্টানো সোজা কাজ। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে পুরোনো ওয়াশার এবং নতুন ওয়াশার যাতে মাপে এক হয়। অনেক সময় হুইল এবং নাট মরচে ধরে একদম টাইট্ হয়ে যায়। তেলে ভিজিয়ে মরচে তোলার চেষ্টা করা যেতে পারে, কিংবা প্রয়োজন বুঝলে হুইল-নাট পুরোটাই বদলে ফেলা যায়। একবার হাতে-কলমে করলে কাজটা মোটেই শক্ত লাগবে না। তবে এ কাজে দুটো ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে—কল সারানোর সময় কলের গায়ে সরাসরি রেঞ্চ বসানো উচিত নয়, তাতে দাগ পড়বে। একটু কাপড় জড়িয়ে তার ওপর রেঞ্চ বসানোই ভাল। আর, কল মেরামতির আগে মেন-লাইনে জল কিন্তু বন্ধ রাখতে হবে অবশ্যই; তোড়ে জল বেরোনোর মুখে দাঁড়িয়ে কোন কাজই সম্ভব নয় আদৌ।



ডিম নিয়ে জানা চাই

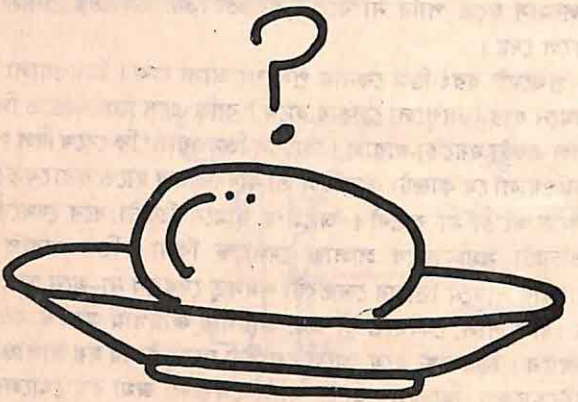
কলম্বাসের ডিম-ভাঙার গল্প সবারই জানা। একটা ডিমকে খাড়া দাঁড় করানোর উপায় যখন কেউ খুঁজে পাচ্ছিলেন না, কলম্বাস ডিমটা টেবিলে ঠুকে ভেঙে সেই ভাঙা দিক বরাবর ডিমটা দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন নাকি! ব্যাপারটা হয়তো কিছু শক্ত ছিল না, তবে কলম্বাসের উদ্ভাবনী চিন্তার প্রশংসা করতে হয় বৈকি। রোজকার জীবনে আমরা কলম্বাস হতে পারি না বলেই হয়তো ডিম আমাদের প্রায়ই বিপাকে ফেলে দেয়।

প্রথমেই বরং ডিম কেনার প্রসঙ্গে আসা যাক। ডিমওয়ালা আলোর সামনে ধরে ডিমগুলো ঠোঙায় রাখে। বাড়ি এসে ডিম ভাঙতে গিয়ে দেখা গেল একটা হয়তো খারাপ। তাহলে ডিমওয়ালা কি দেখে দিল? আসলে ডিমওয়ালা যে কাজটা করেছিল তা যদি নিজের হাতে করা যেত সেক্ষেত্রে ঠকতে হতো না আদৌ। আলোর সামনে ডিমটা ধরে দেখতে হয় যে ভেতরটা সমানভাবে লালাভ দেখাচ্ছে কিনা। ডিম খারাপ থাকলে আলোর সামনে ডিমের ভেতরটা সমসত্ব দেখাবে না—মনে হবে কোথাও বা বেশি লাল, কোথাও বা কম, জায়গায় জায়গায় অস্বচ্ছ কালো ছাপ দেখাবে। ডিম নষ্ট হয়ে গেলে প্রোটিন ভেঙে তৈরি হয় সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন, মিথেনের মতো গ্যাস—সেগুলো জমা হয় খোলের মধ্যে। ভিন্ন মাধ্যম দিয়ে যাবার সময় আলোর প্রতিসরণ হয় ভিন্ন, ফলে যে সব জায়গায় গ্যাস জমেছে সেগুলোকে দেখায় ছেদের মতো—কালো, অস্বচ্ছ।

ডিম নিয়ে আর এক সমস্যা—তার খোসা ছাড়ানো। দেখা যায় কোন কোন দিন ডিমসেদ্ধ থেকে খোসাটা চট্ করে খুলে এলো, আবার কোন কোন দিন দেখা যাবে খোসাটা ভাঙতে গেলেই সঙ্গে ডিমের সাদাটাও উঠে আসছে। অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন ডিমটা হয়তো খারাপ—তাই এই বিপত্তি! প্রকৃতপক্ষে ঘটনা কিন্তু ঠিক তার উল্টো, ডিমটা বেশি তাজা বলেই খোসা ছাড়ান যায় না। শুনতে অবাক লাগছে নিশ্চয়? আসলে সদ্য পাড়া ডিমের ভেতরের অংশ থেকে জলীয় ভাগের বাষ্পীভবন হয় ডিমের খোলার গায়ে আনুবীক্ষণীক ফুটো দিয়ে। এই ফুটোগুলো থাকে ডিমের চওড়া মাথায়।

সদ্য পাড়া ডিমের ভেতর থেকে বাষ্পীভবনের ফলে চওড়া মাথা বরাবর খোলার নিচে আংশিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়, শূন্যস্থান পূরণ করতে ঐ জায়গায় এসে আশ্রয় নেয় বাতাস। ডিম যত বাসি হয়, বাতাস খোলার নিচ বরাবর ডিমের ওপর পাতলা ঝিল্লীর তলায় ছড়িয়ে যায়, খোলা আর ডিমের মাঝখানে তৈরি হয় বাতাসের জামা। ডিম সেদ্ধ করার সময় তাপের প্রভাবে বাতাস বেরিয়ে গেলে সেই জায়গায় জল ঢুকে আসে এবং এই ফাঁক থাকার দরুনই সিদ্ধ ডিম থেকে খোলা সহজেই আলাদা হয়। টাটকা বা সদ্য পাড়া ডিমের খোলার নিচে বাতাসের জামা তৈরি না হওয়ায় খোসা ছাড়ানো কষ্ট কর!

ডিম সেদ্ধ করার সময় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় খোলাটা ফেটে গেল



কিংবা খোলা ছাড়ানোর পর ডিমের চওড়া দিকটার সাদা অংশ বরাবর ডিমের কুসুম উঁকি মারছে। অনেকেই এটা পছন্দ করেন না–বিশেষতঃ সাহেবরা তো নয়ই। এই সমস্যা এড়াতে ডিমসেদ্ধ করার একটা বিলাতী ফরমূলা আছে, এবং ফরমূলাটি যথেষ্ট কার্যকরী। তারা প্রথমে ডিমের চওড়া মাথায় আলপিন দিয়ে একটা ফুটো করে নেন। পাত্রে জল নিয়ে ডিমটা ছেড়ে দেন তাতে। জলে খানিকটা নুন ফেলে তবে সেটা উনুনে বসানো হয়। ডিম সেদ্ধ হয়ে গেলে ঠান্ডা জলে ডিম ধুয়ে তা পরিবেশন করাই রীতি। ডিমের মাথায় আলপিনের ফুটো থাকার দরুণ তাপ পেয়ে ভিতরের বাতাস বেরিয়ে আসে ঐ পথে; সম্প্রসারিত বাতাস খোলার ভেতরের গায়ে অসম চাপ সৃষ্টি করে না, ফলে খোলাও ফাটে না আর।

ঠান্ডা জলে ডিম সেদ্ধ বসালে জলটা গরম হয় আস্তে আস্তে, ফলে ভেতরের বাতাসের সম্প্রসারণও হয় সমানভাবে। আলপিন দিয়ে ফুটো করার একটা বাড়তি সুবিধে আছে–প্রথমেই বাতাসটা তাপ পেয়ে বেরিয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে শূন্যস্থান পূরণ করবে স্বচ্ছ জলের মতো অ্যালবুমিন, যা পরে তাপ পেয়ে সাদা হয়ে যায়। ফলে সেদ্ধ হবার পর খোসা ছাড়ালে তার চেহারা হবে খোলার মতনই নিটোল।

জলে নুন দিলে ডিমের স্বচ্ছ অ্যালবুমিন জমে সাদা হয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি, অল্প তাপেই।

নুন দিয়ে সাদা অংশ জমানোর কায়দাটা জানেন আমাদের অনেক মা–দিদিরাও। পোচ করতে গিয়ে ডিমের সাদা অংশ ঘেঁটে গেলে সামান্য নুন বা লেবুর রস দিয়ে দিলে সাদা অংশটা আর ঘাঁটে না। নুন বা লেবু কিভাবে কাজ করে তার ব্যাখ্যা সম্প্রতি দিয়েছেন রসায়নবিদ্‌রা। তাঁরা দেখেছেন ডিমের স্বচ্ছ অ্যালবুমিন প্রোটিনের অণুগুলো দেখতে গোলাকার–ক্ষুদে ক্ষুদে বলের মতো। এই বিশেষ গোল আকারটি বজায় থাকে বলের ভেতরকার দুর্বল রাসায়নিক বন্ধনী বা 'বন্ডিং'-এর জন্য। তাপের প্রভাবে এই দুর্বল রাসায়নিক 'বন্ড'গুলো ভেঙে স্থায়ী বন্ধনীতে পরিবর্তিত হয়–স্বচ্ছ অ্যালবুমিন জমে হয় সাদা। দুর্বল রাসায়নিক বন্ধনীরা গুণগত বিচারে তড়িৎ-যোজী, ফলে, আশেপাশে আয়নিত অণুর উপস্থিতিতে দুর্বল রাসায়নিক বন্ধন ভেঙে যায় চট করে। নুন বা লেবুর রস আসলে মাধ্যমে বাড়তি 'আয়ন' যুগিয়ে বন্ধন ভাঙতে সাহায্য করে মাত্র।

অনেক সময় দেখা যায় ডিম সেদ্ধ হবার পর, ডিমের কুসুমের মাঝখানটা একটু কালচে-সবুজ দেখায়। অনেকে এটা পছন্দ করেন না। আসলে বাড়তি তাপের প্রভাবে সাদা অ্যালবুমিনের অংশবিশেষ বিশ্লেষিত হয় বা ভেঙে যায়–প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিড ভেঙে বেরিয়ে আসে সালফার আর হাইড্রোজেন। সালফার আর হাইড্রোজেন মিলে তৈরি করে সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন গ্যাস। এই গ্যাস ঠান্ডা জায়গায় জমতে চায়–আর ডিমের কুসুমের ঠিক মাঝখানটা হলো সবথেকে ঠান্ডা। পাশাপাশি কুসুমে থাকে আয়রন বা লোহার অণু যা সালফিউরেটেড হাইড্রোজেনের সঙ্গে বিক্রিয়ায় তৈরি করে আয়রন-সালফাইড। সবজে-বাদামী এই আয়রন সালফাইড জমে ডিমের কুসুমে। কিন্তু গরম থেকে নামিয়েই ডিমটা ঠান্ডা জলে ফেললে জলের সংস্পর্শে খোলাটা হয়ে যায় ঠান্ডা, সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন গ্যাসও কুসুমের

দিকে না গিয়ে চলে আসে খোলার দিকে!

তবে ডিমসেদ্ধ নিয়ে সবথেকে ভাল সমস্যাটা বোধহয় তৈরি হয়েছিল আমাদের পাড়ার টুটুল-বাবুলদের বাড়িতে। পিকনিকে যেতে হবে ভোরে,তাই বেশ কিছু ডিম সেদ্ধ করে ফ্রিজে রাখা হল আগের দিন সন্ধ্যেবেলা। ওদের বাবা আবার সেদিনই রাত্রিবেলা কয়েক ডজন ডিম কিনে ঢুকিয়েছেন ঐ একই ফ্রিজে। সকালবেলা হৈ হৈ কান্ড। এতগুলো ডিম এলো কি করে? সব শুনে তো টুটুল-বাবুনের মাথায় হাত। সেদ্ধ না কাঁচা–চিনবো কি করে? অবশ্য সে যাত্রা ওদের বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন বাবাই–সহজ একটা পরীক্ষার কথা বলে। পরীক্ষাটা আর কিছুই না, মসৃণ টেবিলের ওপর ডিমটা হাতে করে ঘুরিয়ে দেওয়া। সেদ্ধ ডিম ঘুরতে থাকবে বাঁই বাঁই করে লাট্টুর মতো, কিন্তু কাঁচা ডিমের পাক এলোমেলো, একটু ঘুরেই যাবে থেমে। সুতরাং ঘোরার ধরন দেখে সহজেই বোঝা সম্ভব–ডিমটা সেদ্ধ না কাঁচা। এখানে মূল কারণ হল, সেদ্ধ ডিমের ভেতর ও বাইরে দুই-ই কঠিন, ফলে ডিমটা ঘুরতে থাকে সহজেই। কাঁচা ডিমের ভেতরটা তরল, ফলে ঘুরিয়ে দিলে তরলের 'ইনারসিয়া' বা জাড্যের দরুণ সেটা গতি পায় দেরিতে। অন্যভাবে বলা যায়, খোলের তুলনায় ভেতরের তরল দেরিতে ঘোরায় তরল পদার্থ নিজেই ডিমের খোলার ঘূর্ণনগতির ওপর 'ব্রেকের' কাজ করে।

সবশেষে বরং বলি কাঁচা ডিম সংরক্ষণের একটা ঘরোয়া পদ্ধতির কথা। ডিমের খোলার ওপর একটু তেল মাখিয়ে নিলে দিন-সাতেক ডিমকে রাখা যায় অনায়াসেই। কারণটা আর কিছু নয়, তেলের কাজ হলো খোলার ওপরের অনুবীক্ষণিক ছিদ্রগুলোকে বন্ধ করা, যাতে বাইরের বাতাস খোলার মধ্যে ঢুকতে না পারে। আর এটা তো জানাই আছে, বাইরে থেকে অনেক বীজাণুই ঢুকতে পারে ঐ রাস্তা দিয়ে আর তাদের কাজই হলো প্রোটিনকে ভেঙে নষ্ট করা।



টুকিটাকি সমস্যা—১

ব্লটিং বিকল্প

পেন দিয়ে চিঠিটা লিখছিলেন মেজকাকা! মেজকাকার একটা স্বভাব হলো—ঝর্ণা-কলম দিয়ে লেখা। ডট্‌পেনে লিখলে লেখার সৌন্দর্য নষ্ট হয়, লিখতে আরাম পাওয়া যায় না, এমনি নানা খুঁত-খুতুনি আছে তাঁর। সুতরাং চিঠি বা যাই কিছু হোক লিখতে হলে ঝর্ণাকলম তাঁর চাই-ই চাই।

অথচ গোল বাধালো সেই ঝর্ণাকলমই। ঝপাস করে খানিকটা কালি পড়তেই বিরক্ত হয়ে উঠে পড়লেন মেজকাকা।

—পিকলু, দেখ তো, ব্লটিং পেপার আছে কিনা?

খানিকটা খুঁজে কাঁচুমাচু মুখে পিকলু জানালো, —ব্লটিং পেপার নেই। বাড়িতে আর কেউ ফাউন্টেন পেনে লেখে না তাই।

এ সমস্যায় কমবেশি ভুগতে হয়েছে প্রায় প্রত্যেককেই। ব্লটিং পেপারের বিশেষত্ব—ওপরের সূক্ষ্ম তুলোর আস্তরণ কালি টেনে নেয়, কালি ঢুকে পড়ে তুলোর আঁশের আশেপাশে। ব্লটিং পেপারের এই বিশেষ ধর্মের কথাটা জানা থাকলে অনেক কিছুই বিকল্প ভাবা যেতে পারে। যেমন—পাতলা তুলোর টুকরো, ব্ল্যাকবোর্ডের চকের টুকরো কিংবা একটুকরো খবরের কাগজ দিয়েও ব্লটিং-এর কাজ চলতে পারে। ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের তৈরি, ফাঁকে ফাঁকে অজস্র সূক্ষ্ম ছিদ্র! ক্যাপিলারী অ্যাকশনে দিব্যি বাড়তি কালি উঠে আসে লেখার কাগজ বা চিঠির পাতা থেকে!

চিঠির কথা যখন উঠলোই, তখন আর একটা সমস্যার কথা বলি। বিশেষতঃ বর্ষাকালে, জল লেগে চিঠির ঠিকানা এমন ধেবড়ে যায় যে কে যে কাকে চিঠি লিখলো, সেটাই বোঝা মুশকিল হয়ে পড়ে।

এক্ষেত্রে সমাধান হলো—চিঠিতে প্রাপকের নামটা যেখানে লেখা হলো, তার ওপর একটু মোম ঘষে দেওয়া। মোম থাকার দরুন সেটা একটা জল প্রতিরোধক স্তর তৈরি করবে, ঠিকানা ধেবড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না আর।

মোমবাতি খরচ কমাতে

মোমবাতি কাজের জিনিস নিশ্চয়ই, বিশেষতঃ আচমকা লোডশেডিং হলে। মোমবাতির একটা বড় অসুবিধে, চট্ করে ফুরিয়ে যায়। একটা মোমবাতি থেকে আর একটা জ্বালানো বড্ডো বিরক্তিকর ব্যাপার। মোমবাতির আয়ু দীর্ঘস্থায়ী করার একটা সহজ রাস্তা আছে। গোটা মোমবাতিটার সলতে ধরে একবার 'ভার্নিশে'র টিনে চুবিয়ে নেওয়া। ভার্নিশ জিনিসটা পাওয়া যাবে রঙের দোকানে, কিংবা চেয়ে নেওয়া যেতে পারে আসবাবপত্র তৈরির দোকান থেকে। ভার্নিশ শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেলে তা মোমের গায়ে একটা শক্ত খোলা বা আবরণ তৈরি করবে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, মোমবাতিতে মোম জ্বলে যত না আলো দেয়, তার অনেক বেশি মোম নষ্ট হয় গলে, গা-গড়িয়ে নিচে পড়ে। ভার্নিশের কোটিং এ ব্যাপারটা বন্ধ করবে—বাড়বে মোমবাতির আয়ু!

মোমবাতি-বিকল্প

লোডশেডিং-র সময় মোমবাতিরই মতো আর একটা জিনিস হলো 'লম্ফ' বা হারিকেন। অনেক সময় দেখা যায়, বাড়িতে হারিকেন একটা, অথচ আলো দরকার অন্ততঃ তিনটে ঘরে। হাতে একটু সময় থাকলেই 'লম্ফের' বিকল্প বানিয়ে নেওয়া সম্ভব। এর জন্য দরকার একটুকরো কর্ক (ছিপির টুকরো), একটা মাঝারি মাপের খালি শিশি, খানিকটা টোয়াইন সুতো ও খানিকটা জ্বালানী তেল। বিকল্প হিসেবে খানিকটা রান্নার তেলও ব্যবহার করা যায়।

কর্কের মাঝ-বরাবর ফুটো করে টোয়াইন সুতো পরিয়ে নিতে হবে। দেখে নিতে হবে তলার দিকটা যেন খুব লম্বা না থাকে। শিশিতে প্রথমে নিতে হবে খানিকটা জল, তারপর শিশির ধার দিয়ে খুব সাবধানে তেলটা ঢেলে নিতে হবে। অর্থাৎ, জলের ওপর তৈরি হবে তেলের একটা স্তর। স্তরটা ইঞ্চি-খানেক বা ইঞ্চিখানেক হলেই চলবে। জ্বালানোর আগে সাবধানে কর্কটা তেলে ভাসিয়ে দিলেই হবে। খানিকক্ষণ আলোর প্রয়োজনে এ-ধরনের বিকল্প ব্যবস্থা কিন্তু বেশ সুবিধেজনক।



টুকিটাকি সমস্যা–২

পাতিলেবু

না, এ কাহিনী পাতিলেবুর খাদ্য-গুণের গুণগানের ফিরিস্তি নয়। পাতিলেবুতে 'ভিটামিন-সি' থাকে, সর্দিজ্বরে লেবুর রস খাওয়া ভাল–এসব কথা ডাক্তারবাবুদের মুখে শুনে শুনে আমরা এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছি। কিন্তু পাতিলেবুর গুণপানার অনেকটাই এখনো মা-দিদিমাদের 'ট্রেড-সিক্রেট', যেগুলো বংশপরম্পরায় চলে আসছে হেঁসেলের নানা টুকিটাকির সূত্র ধরে। একটা একটা করে বলি বরং। হাতেনাতে পরখ করে দেখা যেতে পারেঃ–

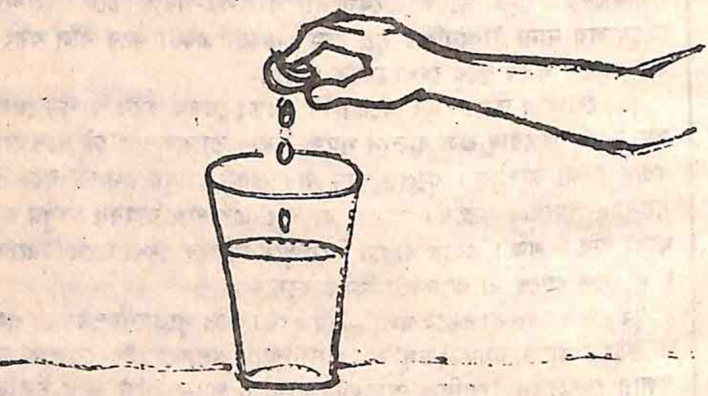
(১) লোহার তারে 'জং' ধরে। বিশেষতঃ যেসব তারে কাপড় মেলা হয়, অহর্নিশি রোদ-জল বাতাস পাচ্ছে যারা। তারের 'জং' চট্ করে দাগ ধরায় জামা-কাপড়ে। ধুলেও যায় না। একটু লেবুর রস চট্ করে এ সমস্যার সমাধান করবে। 'মরচে' বা 'জং'-এর দাগ বরাবর লেবুর রস ঘষো বার দশেক। এবার সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেললে দেখা যাবে 'মরচের দাগ' চলে গেছে বা অনেকটা ফিকে হয়েছে।

(২) 'ওল খেও না ধরবে গলা'–এটা একটা অতি পুরোনো প্রবচন। ওল বা কচুতে থাকে 'র‍্যাফাইডস্' বা 'ক্যালসিয়াম অক্সালেটের' কেলাস, যা গলার ভেতরের শ্লৈষিক আবরণীতে বিঁধে প্রদাহ সৃষ্টি করে–চলতি কথায় 'গলা ধরা'। এর ওষুধ নিয়েও চালু প্রবচন আছে–'বুনো ওল, বাঘা তেঁতুল'। অর্থাৎ তেঁতুলের মৃদু টারটারিক অ্যাসিড, ক্যালসিয়াম অক্সালেটকে দ্রবীভূত করে গলা-ধরার উপশম করে। হাতের কাছে তেঁতুল না থাকলে লেবু দিয়ে কাজ চলবে। কয়েক টুকরো লেবু ভালভাবে চুষে খেলে তাৎক্ষণিক উপকার মিলবে।

(৩) শখ করে পান খেতে গিয়ে 'গাল-পোড়া' মোটেই বিরল ঘটনা নয়। অল্প সময়ের মধ্যে গালের 'পোড়া' বা হেজে-যাওয়া অংশে লেবুর টুকরো ঘষে দিলে আরাম পাওয়া যায়। কারণটা আর কিছুই নয়, বাড়তি চুন বা ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডকে প্রশমিত করে লেবুর জৈব অ্যাসিড।

(৪) একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় বাড়িতে ডুমুর বা কাঁচকলা কাটার সময় মা-বৌদির একটু লেবু নিয়ে বসেন। ডুমুর বা কাঁচকলার কষের দাগ কালো–হাতের চেহারা বিশ্রী করে। চটপট লেবুর টুকরো হাতে রুচ্‌লে নিলে কালো দাগ ধরে না।

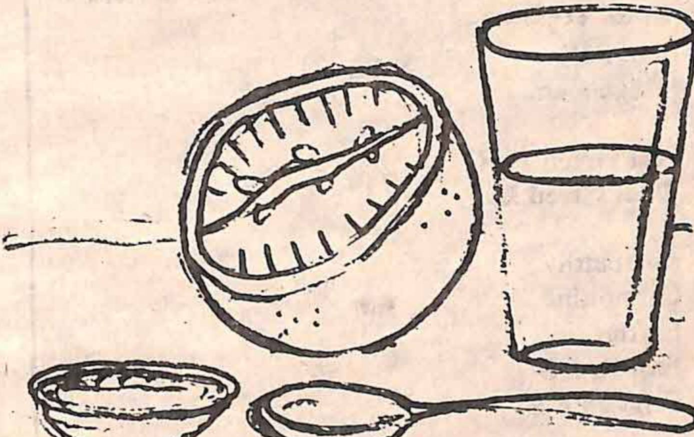
(৫) অনেক তরকারি বা ফল–যেমন কাঁচকলা, ডুমুর বা আপেল কেটে রাখলে কালো বা বাদামী বর্ণ ধারণ করে। এর থেকে রান্নার রঙ বেমানান রকম কালো হতে পারে, যা অনেকেই পছন্দ করেন না। তেমনি সাদা আপেল কাটার পর বাদমী হয়ে গেলে অনেকেই বিরক্ত হন। এটা এড়ানোর একটা সহজ উপায় আছে। এইসব ফল বা সব্‌জি, কাটার পর দু-পাঁচ মিনিট একটু লেবুর জলে ডুবিয়ে রাখা। না না, বেশী লেবু দরকার নেই–কয়েক ফোঁটা লেবুর রসই যথেষ্ট।



লেবুর রস, কেন কালো-দাগ বা বাদামী হওয়া থেকে সবজি বা ফলকে বাঁচায়, এ প্রসঙ্গে দু-একটা রসায়নের কথা বরং বলে নিই। যেসব ফল বা সবজি কাটলে কাল্‌চেপানা হয়ে যায়, তাদের কোষের মধ্যে থাকে 'ট্যানিন' বা 'ট্যানিক অ্যাসিড'। কাটার সঙ্গে সঙ্গে কোষ-আবরণী ভেঙ্গে তা বেরিয়ে আসে। বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে তা পরিণত হয় বাদামী রঙের জটিল যৌগ 'পলিফেনলস্' (Polyphenols)। রসায়নের ভাষায় এর নাম 'জারণ-বিক্রিয়া' বা 'অক্সিডেশন-রিঅ্যাকশন'। লেবুর সাইট্রিক অ্যাসিডে 'জারণ-প্রতিরোধ' বা 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট' ধর্ম আছে, যার ফলে ট্যানিন আর জারিত হয়ে 'পলিফেনল' যৌগ তৈরি করতে পারে না।

অনেক বিজ্ঞানী অবশ্য সবজি বা আপেল কালো হয়ে যাওয়ার পেছনে আরো একটি কারণকে দায়ী করেন, তা হলো একটি বিশেষ 'অ্যামিনো অ্যাসিড'—টাইরোসিন, যা কাটার সময় পরিবর্তিত হয় কালো রঙের অপর এক অ্যামিনো অ্যাসিড মেলানিন'—এ। এর জন্য দায়ী বিশেষ এক এনজাইম বা উৎসেচক—টাইরোসিনেজ (Tyrosinaze)। এই উৎসেচকটির একটি প্রয়োজনীয় অংশ হল লোহার অনু। লেবুর সাইট্রিক অ্যাসিড এই লোহার অনুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে, নিষ্ক্রিয় করে 'টাইরোসিনেজ' এনজাইমটিকে। ফলে টাইরোসিন আর মেলানিনে রূপান্তরিত হতে পারে না, সাদা ফলও আর বাদামী হয় না।

পরিশেষে বলি, গরমের দিনে লেবু সংরক্ষণের কথা। গরমের দিনে লেবুর দাম বাড়ে, অথচ লেবু কেটে বেশী-দিন ফেলে রাখা যায় না। যদি অল্প কয়েকফোঁটা লেবুর রসের প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে একটা পরিষ্কার মোটা সূঁচ দিয়ে লেবুর গা ফুটো করে রস বের করা সম্ভব। ভিজে কাপড়ের টুকরো দিয়ে গোটা লেবুটা ঢেকে রাখলে লেবু সতেজ থাকে অন্ততঃ চার-পাঁচদিন।



বাজারের ভেজাল ধরতে হলে

বাজার থেকে আনা গোটা হলুদের প্যাকেটটা খুলে মুখ বাঁকালেন মাসীমা,–কোথা থেকে এই বস্তাপচা জিনিস আনলি বাবা পল্টু ? হলুদ না মাটির ঢেলা ? ভাল হলুদের রং হবে গাঢ়, গা হবে মসৃণ।

শুধু মাসীমাই নন, প্রায় প্রতি বাড়িতেই খাবার বা রান্নার জিনিসপত্রে রঙের ব্যাপারে অহেতুক কিছু দুর্বলতা থেকেই থাকে। সাদা মিষ্টির থেকে রঙিন মিষ্টি আমাদের মন টানে বেশী, গুঁড়ো মসলা, মাখন, ঘি–এদের রঙের উজ্জ্বলতা যত বেশী হয়, আমরা তত খুশী মনে এগুলো কিনি। কিন্তু একটা প্রশ্ন বোধহয় ভাবা উচিত–রঙীন খাবার বিপদ্‌জনক নয় তো ? প্রসংগত বলে রাখা ভাল, আমাদের দেশে প্রিভেনশন অফ ফুড অ্যাডালটারেশন অ্যাক্ট বা ভেজাল নিরোধক আইন বলে একটি আইন চালু আছে। এই আইন বলছে খাবার জিনিসে মেশান যাবে আলকাতরা-জাত মাত্র এগারোটি রং, এবং প্রতি কিলোগ্রাম খাবারে সর্বোচ্চ কত মিলিগ্রাম পরিমাণে ঐ রং মেশান যেতে পারে তারও মাত্রা নির্দিষ্ট করা আছে। এই রংগুলি হল–

Blue FcF Indigo Carmine	নীল
Fast Green FcF Wool Green Bs	সবুজ
Amaranth Carmoisine Erythrosine East Red E Ponceau 4 R	লাল
Sunset Yellow	কমলা
Tartrazine	হলুদ

মুশকিল হল, আইন থাকলেও আইন মানতে চান না প্রায় কেউই। অনুমোদিত রঙের দাম বেশী, ফলে সস্তার ক্ষতিকারক রঙ খাবারে মেশানো হচ্ছে যথেচ্ছভাবে। কয়েকবছর আগে লক্ষ্মৌর টক্সিকোলজিক্যাল রিসার্চ সেন্টারের বিজ্ঞানীরা এক সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে বাজারে চালু রঙিন খাবারদাবারের মধ্যে শতকরা সত্তরভাগেই যে রং মেশানো হয়, তা অনুমোদিত রঙের তালিকার বাইরে। এই সব অনুমোদিত নয় এমনি রঙের তালিকা বিশাল–তবে তার মধ্যে নাম করা যেতে পারে দু-একটির, যেমন মেটানিল ইয়োলো, ম্যালাসাইট গ্রীণ, লেড ক্রোমেট, আয়রণ অক্সাইড, কপার সালফেট, কঙ্গো-রেড ইত্যাদি ইত্যাদি। এদের প্রত্যেকটিরই কিন্তু শরীরে বিষক্রিয়া আছে। বাজারে যে রংটা সব থেকে বেশী চালু, তা হল মেটানিল ইয়োলো। হলুদ রঙ হিসেবে এর ব্যবহারও ব্যাপক–বেসন, হলুদ, গুঁড়ো



মসলা, জিলিপি, মিহিদানা, বোঁদে, মাখন, ঘি এমনকি আলুর দমের রং উজ্জ্বল করতেও এর ব্যবহার আছে। এর এত বেশী ব্যবহারের কারণ হল যে এটি সহজে জলে গুলে যায়, সহজলভ্য এবং সস্তা। তাই গুদামজাত বহু পুরোনো মুগ বা ছোলার ডাল বা বেসনকে তাজা দেখাতে বা লোভনীয় করে তুলতে এর জুড়ি মেলা ভার। এই সব রং থেকে কী কী শারীরিক ক্ষতি হতে পারে তার হিসেবও দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে যে সব অসুখগুলো দেখা দিতে পারে, তার লিস্টে আছে হজমের গন্ডগোল, রক্তাল্পতা, লিভারের কার্যক্ষমতা নষ্ট হওয়া, দৃষ্টিশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া–গন্ডগোলের জের পক্ষাঘাত, টিউমার বা ক্যানসার পর্যন্ত গড়ানোও বিচিত্র নয়!

বাজারের ভেজাল ধরতে হলে

বাজার থেকে আনা গোটা হলুদের প্যাকেটটা খুলে মুখ বাঁকালেন মাসীমা,–কোথা থেকে এই বস্তাপচা জিনিস আনলি বাবা পল্টু? হলুদ না মাটির ঢেলা? ভাল হলুদের রং হবে গাঢ়, গা হবে মসৃণ।

শুধু মাসীমাই নন, প্রায় প্রতি বাড়িতেই খাবার বা রান্নার জিনিসপত্রে রঙের ব্যাপারে অহেতুক কিছু দুর্বলতা থেকেই থাকে। সাদা মিষ্টির থেকে রঙিন মিষ্টি আমাদের মন টানে বেশী, গুঁড়ো মসলা, মাখন, ঘি–এদের রঙের উজ্জ্বলতা যত বেশী হয়, আমরা তত খুশী মনে এগুলো কিনি। কিন্তু একটা প্রশ্ন বোধহয় ভাবা উচিত–রঙীন খাবার বিপদ্জনক নয় তো? প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল, আমাদের দেশে প্রিভেনশন অফ ফুড অ্যাডালটারেশন অ্যাক্ট বা ভেজাল নিরোধক আইন বলে একটি আইন চালু আছে। এই আইন বলছে খাবার জিনিসে মেশান যাবে আলকাতরা-জাত মাত্র এগারোটি রং, এবং প্রতি কিলোগ্রাম খাবারে সর্বোচ্চ কত মিলিগ্রাম পরিমাণে ঐ রং মেশান যেতে পারে তারও মাত্রা নির্দিষ্ট করা আছে। এই রংগুলি হল–

Blue FcF Indigo Carmine	নীল
Fast Green FcF Wool Green Bs	সবুজ
Amaranth Carmoisine Erythrosine East Red E Ponceau 4 R	লাল
Sunset Yellow	কমলা
Tartrazine	হলুদ

মুশকিল হল, আইন থাকলেও আইন মানতে চান না প্রায় কেউই। অনুমোদিত রঙের দাম বেশী, ফলে সস্তার ক্ষতিকারক রঙ খাবারে মেশানো হচ্ছে যথেচ্ছভাবে। কয়েকবছর আগে লক্ষ্মৌর টক্সিকোলজিক্যাল রিসার্চ সেন্টারের বিজ্ঞানীরা এক সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে বাজারে চালু রঙিন খাবারদাবারের মধ্যে শতকরা সত্তরভাগেই যে রং মেশানো হয়, তা অনুমোদিত রঙের তালিকার বাইরে। এই সব অনুমোদিত নয় এমনি রঙের তালিকা বিশাল–তবে তার মধ্যে নাম করা যেতে পারে দু-একটির, যেমন মেটানিল ইয়েলো, ম্যালাসাইট গ্রীণ, লেড ক্রোমেট, আয়রণ অক্সাইড, কপার সালফেট, কঙ্গো-রেড ইত্যাদি ইত্যাদি। এদের প্রত্যেকটিরই কিন্তু শরীরে বিষক্রিয়া আছে। বাজারে যে রংটা সব থেকে বেশী চালু, তা হল মেটানিল ইয়েলো। হলুদ রঙ হিসেবে এর ব্যবহারও ব্যাপক–বেসন, হলুদ, গুঁড়ো



মসলা, জিলিপি, মিহিদানা, বোঁদে, মাখন, ঘি এমনকি আলুর দমের রং উজ্জ্বল করতেও এর ব্যবহার আছে। এর এত বেশী ব্যবহারের কারণ হল যে এটি সহজে জলে গুলে যায়, সহজলভ্য এবং সস্তা। তাই গুদামজাত বহু পুরোনো মুগ বা ছোলার ডাল বা বেসনকে তাজা দেখাতে বা লোভনীয় করে তুলতে এর জুড়ি মেলা ভার। এই সব রং থেকে কী কী শারীরিক ক্ষতি হতে পারে তার হিসেবও দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে যে সব অসুখগুলো দেখা দিতে পারে, তার লিস্টে আছে হজমের গন্ডগোল, রক্তাল্পতা, লিভারের কার্যক্ষমতা নষ্ট হওয়া, দৃষ্টিশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া–গন্ডগোলের জের পক্ষাঘাত, টিউমার বা ক্যানসার পর্যন্ত গড়ানোও বিচিত্র নয়!

তাহলে ? আমাদের করার কি কিছুই নেই ? একেবারে নেই যে তা নয়। যেমন—রঙিন জিনিস নির্ভেজাল কিনা তা নজর রাখার দায়িত্ব ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস ইনস্টিটিউটের। সুতরাং যে সব রঙিন খাবারে I S I ছাপ আছে সেগুলো কেনাই যুক্তিযুক্ত। পাশাপাশি দু-একটা সহজ পরীক্ষার কথা জেনে রাখলে ক্ষতি নেই—কারণ সব জিনিস তো আর প্যাকেট বন্দী হয়ে I S I পরীক্ষিত নয়!

প্রথমে বরং ধরা যাক মেটানিল ইয়োলোর কথা। হলুদ রঙের কোন জিনিস—গুঁড়ো মসলা, বেসন বা ডাল-এর রঙ নিয়ে সন্দেহ দেখা দিলে, জিনিসটা ঠান্ডা জলে ঝাঁকিয়ে নিয়ে ঐ জলে কয়েক ফোঁটা গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (হাতের কাছে যেটা সহজলভ্য—তা হলো বাথরুম পরিষ্কার করার মিউরেটিক অ্যাসিড) মেশান যেতে পারে। মেটানিল ইয়োলোর উপস্থিতিতে জলের রঙ পালটে হবে লালচে বেগুনী।

চা-পাতা থেকে রংদার লিকার হওয়ার জন্যে অনেক অসাধু ব্যবসাদার রঙ ব্যবহার করেন। এটা বোঝার সহজ উপায়—ভিজে ব্লটিং-কাগজের ওপর খানিকটা চা-পাতা ছড়িয়ে দেওয়া। রঙ থাকলে কাগজে বাদামী, লাল বা গোলাপী ছোপ ফুটে উঠবে।

শুকনো লঙ্কা চকচকে দেখাতে অনেকসময় লাল রঙ মাখানো হয়। একটু তুলো লিকুইড প্যারাফিনে ভিজিয়ে লঙ্কার গায়ে ঘষলে যদি দেখা যায় লাল রঙ উঠছে সেক্ষেত্রে সে লঙ্কা না কেনাই ভাল। একই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে পটল বা অন্যান্য সবুজ তরি-তরকারীর ওপরও। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে সবজির গা থেকে একটু চেঁচে নিয়ে সেই গুঁড়ো কয়েক ফোঁটা জলে মেশালে জল যদি সবুজাভ হয়ে ওঠে সেক্ষেত্রে আশঙ্কা করা অমূলক নয় যে সবজিতে ম্যালাসাইট গ্রীণ বা ঐ ধরনের কোন রঙ মাখানো আছে!

